বঙ্গভাষাই কালে সমগ্র নব্যভারতের ভাষা হওয়ার আশাও নিতান্ত আকাশকুসুম বোধ হয় না। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এরূপ ভাষা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে না,—হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। রায় মহাশয় যেরূপ "কাক ও কলাজীবী"র বা আদালতের মওয়াক্কেলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'ভাখা' নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই-রূপ গৃহস্থালির 'ভাখা' বা শ্রমজীবীর 'ভাখা'য় পরস্পর ন্যূনাধিক পার্থক্য থাকাই সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার কল্পে সে সমস্ত 'ভাখা'র সমন্বয় বা বিলোপ সাধন সম্ভব কি না, পক্ষান্তরে বিষয় বিশেষের পরিভাষা সংগ্রহে সঙ্কলনকর্ত্তাগণের ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় হইলেও, তাহা বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধনোপযোগী প্রকৃত উপাদান কি না, তদ্বি-ষয়ে সন্দেহ আছে। রায় মহাশয়ের বোম্বাই ও ত্রিবাঙ্কুরবাসী বন্ধুদ্বয় কিরূপ বাঙ্গালা শিখি-বার উপযোগী পুস্তক পাইতে বা প্রণালী জানিতে চাহিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু নৈশ বিদ্যালয়ে মাত্র পঠন, লিখন ও গণিতের মূলসূত্র চারিটী শিক্ষাই যাহার চরম প্রয়োজন, তাহার জন্য, আর রায় মহাশয়ের ন্যায় ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য একই ভাষার প্রচলন সমীচীন বোধ হয় না।

রায় মহাশয় আর একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"সামাজিক শাসনের ন্যায় ভাষার শাসন সাধারণের পক্ষে মঙ্গলময়।" দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার কোন শাসক নাই, তাই সহজেই উহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। বাল্যকালে কোন কবিতা-প্রিয় বৈয়াকরণের বিধান শুনিয়াছিলাম—

'ঋ-র-ষ'এর পর যদি দন্ত্য নকার থাকে।

কচাৎ ক'রে কাট্‌বে মাথা—কোন্ দাদা তা'র রাখে?" এখনও অনেক বিষয়ে ঐরূপ কঠোর শাসনের প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য একদিকে ব্যাকরণ, কোষ ইত্যাদি শাস্ত্রের অসদ্ভাব, অন্যদিকে শাসনদণ্ড পরি-চালকের ঔদাসীন্য, দেখিতে পাওয়া যায়। সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মগুণে আমরা ইংরাজি পদ-প্রত্যয়াদির সুব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি এবং তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম 'বাধতি'র ন্যায় কর্ণে বাধে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সেরূপ স্থলে আমরা সকলেই স্বেচ্ছাধীন। বর্ত্তমান প্রবন্ধোপলক্ষেই রায় মহাশয় যেখানে লিখিলেন 'লড়াইতে' আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিও সেস্থলে "লড়ায়ে" লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না, পরন্তু অপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে একস্থানে লিখি-লেন, পথে অন্যত্র লিখিলেন, "পথেতে।"† ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টা সুষ্ঠু প্রয়োগ, কে শাসন করিবে? ইংরাজি assassination শব্দে একটা s [illegible] কম করিলে পাতক-গ্রস্ত হইতে হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় "উশৃঙ্খলতা"‡ লিখিয়া অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যায়। "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" নামক দেশপূজ্য গ্রন্থেও আমরা 'বাহ্যিক' 'একত্রে,' 'পরিত্যাজ্য,' 'আয়ত্তাধীন,' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি, ¶—এখনও 'অপরিত্যাজ্য,' †† 'মূল্যাধিক্যতা' ‡‡ প্রভৃতি শব্দ অবাধে চলিতে দেখিতেছি। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যবহার প্রশস্ত, কোন্‌টা অপ্রশস্ত—কোন্ কথা শুদ্ধ, কোন্ কথা ব্যাকরণ-দুষ্ট—বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সূত্রে কি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই? কিছুদিন গত

† নব্যভারত।	২৬শ খণ্ড।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।	২০৫ পৃষ্ঠা।
‡ ঐ	ঐ	৭ম	৩৪৬ "
¶ সাহিত্য সেবক	২য় ভাগ	১১শ	৩২৯ "
§ নব্যভারত	২৬শ খণ্ড	৩য়	১২৮ "
††. ঐ	ঐ	২য়	৮০ "

হইল, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এরূপ স্থলে একটু শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই, বোধ হয়, তাঁহার সে শাসন মানিল না, তিনিও তজ্জন্য উদ্যমে ভঙ্গ দিলেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা অনায়াসে এরূপ শাসন চালাইতে পারেন, কিন্তু সে পক্ষে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী" হইতে পারেন, কিন্তু প্রবন্ধের ভাষাগত অশুদ্ধি সংশোধনের জন্য কি সম্পাদকগণের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে? বাঙ্গালার সুপ্রণালী-সঙ্গত ব্যাকরণ ও কোষ প্রকাশের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ বহুদিন হইতে উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত মত-পার্থক্যে, বোধ হয়, সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বিলম্ব ঘটিতেছে। এরূপ মতভেদ বঙ্গভাষার দীর্ঘজীবনসূচক বলিয়া আনন্দকর হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ভাষার প্রকৃত সংস্কার সুদূরপরাহত বলিয়া আশঙ্কা জন্মে।

উপসংহারে, "লিখিত ও কথিত ভাষার অতিরিক্ত প্রভেদ" ঘুচাইবার জন্য, রায় মহাশয় দুই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"এক পথ ধ্বনিসংবাদী বানান, অন্য পথ বানান-সংবাদী উচ্চারণ।" বহুদিন হইল, "বঙ্গীয় বর্ণমালা"র* আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, "বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই, উচ্চারণের শক্তি না থাকিলেও, আমাদিগকে অনর্থক অনেকগুলি বর্ণ অদ্যাপি বহন করিতে হইতেছে। নচেৎ, ধ্বনির দ্যোতক চিহ্ন হিসাবে বর্ণের বাস্তব প্রয়োজন স্বীকার করিলে, বঙ্গভাষা হইতে অনেক বর্ণ অনায়াসে বর্জ্জন করা চলিত। * * * অধিকাংশ স্থলেই ঙ'র কার্য্য ং দ্বারা এবং ঞ'র কার্য্য ণ দ্বারা সাধিত হইতে পারে, পরন্তু দ্বিবিধ জ ন ও ব, ত্রিবিধ স ও ঋকারের আদৌ প্রয়োজন দেখা যায় না,—য এরও বড় আবশ্যকতা বোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি, কোন সংস্কৃত শব্দের বর্ণমালায় স্থান দিতে হইয়াছে।" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় উল্লিখিত মন্তব্যে আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন রায় মহাশয়ের নির্ব্বাচিত "কোন্ পথে বড় বে যাইতে পারা যায়" জানিবার জন্য ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাতে কি বলেন, শুনিবার জন্য, আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

কমলাকান্ত কথা-লহরী।

প্রঃ—ইংরাজেরা এই সুদীর্ঘকাল যে আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন, তাহার ফলে উঁহাদের লাভ লোক্‌সান কতদূর দাঁড়াইয়াছে?

উঃ—ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যাধিকারী হইয়া উঁহারা যে পার্থিব ঐশ্বর্য্যে বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্লাইব যখন প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার কথামত বাঙ্গালায়

* ভারতী। ২৫শ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তখনকার রাজধানী মুরসিদাবাদ লণ্ডন অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, আর এখন লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ধনবত্নপূর্ণা নগরী। পুরাতন কথা দূরে থাকুক, মোগল সাম্রাজ্যের সময় যে সকল ইউরোপীয় পর্যাটক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়া যান যে, ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধ রাজ্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। এ প্রকার ধনধান্যভরা দেশ পৃথিবীতে আর একটী ছিল কিনা সন্দেহ। মেকলে সাহেব সত্য সত্যই বলিয়াছেন :—

"The empire which Baber and his Moguls reared in the sixteenth century was long one of the most extensive and splendid in the world In no European kingdom was so large a population subject to a single prince, or so large a revenue poured into the treasury The beauty and magnificence of the buildings erected by the sovereigns of Hindostan amazed even travellers who had seen St Peter's The innumerable retinues and gorgeous decorations which surrounded the throne of Delhi dazzled even eyes which were accustomed to the pomp of Versailles Some of the great viceroys who held their posts by virtue of commissions from the Mogul ruled as many subjects as the king of France or the Emperor of Germany Even the deputies of these deputies might well rank, as to extent of territory and amount of revenue with the Grand Duke of Tuscany or the Elector of Saxony" —Macaulay's Lord Clive"

অর্থাৎ একজন ভূপতির অধীনে একরূপ বিপুলসংখ্যক লোক পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না; এবং এদেশের সুরম্য হর্ম্ম্যাদি ও রাজধানীর বাদশাহী কাণ্ডকারখানা, লোক লস্কর, শ্রীসৌন্দর্য্য, জাঁকজমক অতুলনীয় বলিয়া পরিব্রাজকগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের প্রাদেশিক সুবাদারগণের প্রজা-সংখ্যা ফরাসীরাজ বা জর্ম্মাণ সম্রাটের সমান ছিল, এবং ইহাদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারা টাস্কেনি বা সাক্সনির অধীশ্বরের সমপরিমাণ রাজত্ব ও রাজস্ব উপভোগ করিতেন।

আর, যে পোড়াদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ আমরা এত ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, নানা প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহার বর্ণনাকালে উক্ত শ্বেতাঙ্গ মহাত্মা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যেন কোন বাজীকরের যাদুমন্ত্রে সে সব সুখসমৃদ্ধি কর্পূরের মত উড়িয়া বায়ুগত হইয়াছে, শূন্য ভাণ্ড মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বলেন :—

"Of the provinces which had been subject to the house of Tamerlane the wealthiest was Bengal No part of India possessed such natural advantages both for agriculture and for commerce * * The rice fields yield an increase such as is elsewhere unknown. Spices, sugar, vegetable oils, are produced with marvellous exuberance. The rivers afford an inexhaustible supply of fish * * * Bengal was known through the East as the garden of Eden, as the rich kingdom * * * * Distant provinces were nourished from the overflowing of its granaries, and the noble ladies of London and Paris were clothed in the delicate produce of its looms"— Ibid.

অর্থাৎ তৈমুর বংশের করতলস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট ;—কৃষিবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে প্রকৃতি ইহার সহায়। ভাগীরথী প্রসাদাৎ বঙ্গদেশের ভূমি সুজলা সুফলা সর্ব্বশস্যাঢ্যা। জমির অনুপম উর্ব্বরতার সঙ্গে ইহার নদীসমূহ বিধাতা কর্তৃক অফুরন্ত মীনভাণ্ডার হওয়ায়, ধান্যাদি, মৎস্য, বহুবিধ তৈল, মশলা, শর্করা

প্রভৃতি অধিবাসীগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। বঙ্গের বিভব প্রাচ্য জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর দেশসমূহ ইহার উদ্বৃত্ত ব্রীহিযবাদি দ্বারা পোষিত হইত, এবং লণ্ডন ও পারিসের সম্ভ্রান্ত যোষিদ্গণের অঙ্গসৌষ্ঠবার্থ এখানকার জগদ্বিখ্যাত তন্তুবায় সম্প্রদায় বহুমূল্য সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যোগাইতেন।

এহেন রত্নগর্ভা ভূভাগ এই দীর্ঘকাল যাঁহাদের করায়ত্ত রহিয়াছে, তাঁহারা যে বিপুল বিভবের অধিকার হেতু বুকের ছাতি ফুলাইয়া আর সকলকে তৃণজ্ঞান করিয়া চলিবেন, ইহা আর বেশী কথা কি? ঐহিক সুখ সম্ভোগে তাঁহারা যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, ইহাতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় না। পরন্তু অর্থ যে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূল, যেখানে ধনরাশি বিদ্যমান, সেইখানেই কলি-রাজের মাহাত্ম্য প্রকাশ, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই, এবং ইহারা যে বর্ত্তমান সময়ে তাহার জীবন্ত সাক্ষীরূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাহা সংসারের বুঝিতে বাকী নাই। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইংরাজ যে ক্রমে মানব জীবনের গুরুতর বিষয় সমূহে অবনত হইতেছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে কম ক্ষতির কথা নহে। এই হতভাগা দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিবন্ধন তাঁহারা যে মনুষ্যোচিত উচ্চ গুণ সমূহ হারাইতেছেন, তাহা দেখাই-তেছি। প্রথমঃ—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন, পদার্থ মাত্রেই অন্য পদার্থে শক্তি বিকীর্ণ করে, এবং অন্য পদার্থ হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। শীতোষ্ণ বস্তুদ্বয় একত্র থাকিলে উক্ত নিয়মানুযায়ী পরস্পরের ভাব বিনিময় দ্বারা উভয়ে সমগুণাক্রান্ত হয়। তদ্রূপ সংস্রবের দোষগুণে মানুষ যে ক্রমে অবনত-উন্নত হইতে থাকে, তাহা বোধ হয়, বেশী কথার দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আমরা সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, মহানুভব আর্য্য শূরবীরগণের বংশাবতংশ বলিয়া গৌরব করিতে পারি, রামায়ণ মহাভারত বেদোপ-নিষৎ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থনিচয়ের প্রণেতারা আমাদের নিকট কুটুম্ব হইতে পারেন, ব্যাস, শুক, নারদাদি পুণ্যশ্লোক মহর্ষিবৃন্দের সহিত আমাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে পারি; পরন্তু এই সুদীর্ঘকাল জ্ঞানধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অবস্থায় নানাজাতীয় বেদাচার-বিহীন ইহ-সর্ব্বস্ববাদী ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ লোকের দাসত্ব করিতে করিতে আমরা যে দেহাত্মবোধী অন্তঃসার-শূন্য হীনমতি নীচাশয় হইয়া পড়িয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার ত কোনরূপ উপায় দেখি না। আমাদের মত সাহসহীন ভীত-স্বভাব কাপুরুষগণ যে নানাবিধ অপকৃষ্ট গুণের আধার হইবে, তাহা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। নিষ্ঠা, প্রেম, অর্জ্জবাদি যেমন বীররাচিত গুণ, জঘন্য স্বার্থপরতা, অসত্যাচরণ, কৌটিল্যাদি তেমনি হীনবীর্য্য ভীরুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে গিয়া গুণবান ব্যক্তিগণ যে ক্রমে নিকৃষ্টের মত দোষগ্রস্ত হইবেন, তাহা আশ্চ-র্য্যের বিষয় নহে। অপরন্তু বলহীনের ক্রটি দুর্ব্বলতা হেতু ক্ষমবানের যদি ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়, তাহা হইলে তেজীয়ানের ক্রমান্বয়ে ক্রোধ, মোহ, স্মৃতি-বিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ হইবার কথা। দ্বিতীয়,—পদাশ্রিত অসহায় মেষবৎ জীবগণের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের অবাধ ক্ষমতা ও অবকাশ পাইয়া কেহ নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না। নিয়ত চিত্তবিকারের

হেতু দুর্জ্জয় প্রলোভনাদি সম্মুখে উপস্থিত হইলেও চিরকাল তাহার শক্তি অতিক্রম করিয়া অবিকৃতচিত্তে চলিতে পারা সংসারী বদ্ধ জীবের কাজ নয়; কেবল মাত্র শমদমতিতিক্ষাদি অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী পূতাত্মা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যের উহা একান্ত সাধ্যাতীত বলিতে হইবে।

অধুনা বৃটিশজাতির যে দৈহিক ও মানসিক অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা তাঁহাদের মধ্যে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিগণ বেশ দেখিতে পাইতেছেন। লণ্ডনের দুইখানি পত্রিকায় অল্পদিন হইল যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রবণ কর :—

"Undeniable statistics are available to prove the serious physical decline in the race during the last fifty years through the migration to town from country-life. These statistics show that we are rapidly becoming a shorter and lighter race, but, to an even more serious extent a narrow chested one as well."

"This deplorable decline in the physical power of the British people has its concomitant evils—falling birth-rate, greater infant mortality owing to congenital defects and premature child-birth."
Graphic.

অর্থাৎ, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে (রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে) বৃটনের বিস্তর লোক পল্লিগ্রাম ত্যাগ করত নগরবাসী হওয়া হেতু দেহ খর্ব্ব ও লঘু এবং বক্ষঃস্থল সংকীর্ণ হইতেছে। ইহার ফলে জন্ম সংখ্যার হ্রাস, শৈশবে-মৃত্যু বৃদ্ধি ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম হইতেছে। আর একখানি মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ:—লর্ড মিথ্ (Lord Meath) প্রশ্ন করিতেছেন ও নিজে উত্তর দিতেছেন,—

"Are we losing grit as a Nation—Yes."

"Have we the grit of our forefathers?—No"

grit শব্দের অর্থ তিনি বলেন,—

'The virile spirit which makes light of pain and physical discomfort, and rejoices in the consciousness of victory over adverse circumstances, and which regards the performance of duty, however difficult and distasteful, as one of the supreme virtues of all true men and women."

অর্থাৎ যে হৃদয়ের বল ও আন্তরিক তেজের প্রভাবে মানুষ কায়িক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশকে অগ্রাহ্য করতঃ প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়লাভ সহকারে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, এবং হাজার কটু ও কঠোর হইলেও কর্ত্তব্যপালনে কখন পরাঙ্মুখ হয় না।

ইংরাজ মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে উক্ত লর্ড বলেন,—

"Some girls decline to marry unless provided with luxury unheard of by their mothers"

"Some marry a man for his money or position, and then refuse to live with him"

"Mothers are not found so often in the nursery and school-room as their ancestors."

"Women to-day show courage and endurance in sport and society but what of discipline and self-control in daily duties?'

"The middle class woman apes her fashionable sister, and by her extravagance often ruins her husband."

অর্থাৎ,—কোন কোন তরুণী ভোগবিলাসের সুবন্দোবস্ত না হইলে বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের গর্ভধারিণীরা যে সকল আমোদপ্রমোদ সুখ স্বচ্ছন্দতার কথা কর্ণেও শুনেন নাই, ইঁহারা তাহাই চান।

কেহ কেহ কেবলমাত্র স্বামীর ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদার পানে তাকাইয়া বিবাহ করেন, কিন্তু পরে পতিসহবাসে থাকিতে বিরত হয়েন।

জননীগণ সেকালের মত সর্ব্বদা নার্সারি বা শিশুদের প্রকোষ্ঠে এবং স্কুলরুম বা শিক্ষাগৃহে কাজ করেন না।

আধুনিক রমণীরা কেবল ক্রীড়া কৌতুকে ও মজলিসে বিক্রম ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, নৈতিক কার্য্যে ত নিয়ম প্রণালী ও আত্মসংযম দেখিতে পাওয়া যায় না।

মধ্যবিত্ত ভামিনীগণ ফ্যাশনবতীদের অনুকরণে মনোযোগী থাকিয়া অমিতব্যয় দ্বারা পতির সর্ব্বনাশ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত লর্ডমিথ্ আরও বলিয়াছেনঃ—

"Labour in the present day is a thing to be avoided not to be proud of."

"To avoid dismissal is the limit of duty."

"Other nations commence work at five or six in the morning. In the West End of London no business can be transacted before 9 or 10 Amm"

অর্থাৎ,—বর্ত্তমান সময়ে পরিশ্রম করা গৌরবের বিষয় মনে করা দূরে থাকুক, সকলেরই মেহনত এড়াইবার চেষ্টা।

কর্ম্মচ্যুত না হইয়া কোন প্রকারে চাকরী বজায় রাখিয়া চলিতে পারাই কর্ত্তব্যের চরম বলিয়া বিবেচিত।

অন্যান্য জাতিরা প্রাতে পাঁচ ছয়টার সময় দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, কিন্তু লণ্ডনের পশ্চিমাংশে (যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকদের বাস) নয়টা দশটার পূর্ব্বে কোনই কাজ হয় না।

তারপর শুনঃ—

"Slackness is found among the leissured rich, who will not work as once they would without pay for the public benefit."

"There is a general slackness among all classes of the population. 'Pleasure is the god—self-indulgence the object aimed at. Hence the increase of suicides, men, women and even children will not tolerate hardship."

অর্থাৎ,—নিষ্কর্ম্মা ধনীগণ পূর্ব্বে যেমন সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিনা বেতনে কাজ করিতেন, এখন আর সেরূপ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মধ্যে এতই শৈথিল্য দেখা যাইতেছে।

সকল শ্রেণীর লোক মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ পাইতেছে। বিলাসই এখন উপাস্য দেবতা, আত্মসুখই লক্ষ্য। একারণ আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। শিশুরা পর্য্যন্ত কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে না।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, ভারতের বিপুল সম্পত্তি কি প্রকারে ইংলণ্ডের উপর বিষের ক্রিয়া করিতেছে। উঁহারা নিজেই বলিতেছেন, অপর কাহারও কথা নয়, যে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বিলাসব্যসনের গরলে বৃটিশ নরনারীর দেহমন জর্জ্জরিত হইয়া অবনতির দিকে ধাবমান হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী লর্ড মিথ্ ঐ যে কথাটী বলিয়াছেন যে, যেখানে কর্ত্তব্যপালন কঠোর বা কটু ব্যাপার, সেখানে ইংরাজজাতি অধুনা মুখ ফিরাইয়া বসিতেছেন, উহাই মারাত্মক, উহাই সর্ব্বনাশের মূল। ঐ অবস্থা ঘটিলেই মানুষ নীতিবন্ধন লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, যে হেতু নীতিবিগর্হিত পথ ব্যতীত কর্ত্তব্য এড়াইবার উপায় নাই। নৈতিক অবনতই

যে সর্ব্বিধ অধঃপতনের মূলীভূত কারণ,তাহা সংসারে নিত্য দেখা যাইতেছে। কর্ত্তব্য কথাটা বড় শক্ত জিনিস। উহার ইংরাজী প্রতিশব্দ duty, যাহার প্রতি যাহা duty অর্থাৎ যাহার নিকট যে, ঋণ আছে, সেই প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া। সেই কর্ত্তব্যপালনে বা ঋণ পরিশোধে যখন উঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেছে, তখন পরিণাম শুভ নয়। ঋণ লইবার বেলা বেশ মিষ্ট লাগে, কিন্তু পরিশোধের সময় অতি অপ্রিয় বোধ হয়, সেটাত ভাল কথা নয়, উহার দ্বারা হৃদয়ের যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, তাহা ষোল আনা কলুষকল্মষের পরিচায়ক। বৃটনবাসীর সম্বন্ধে ঐ কথাটা যে অধিক নয়, তাহার প্রমাণ আমাদের সঙ্গে আধুনিক ব্যবহার। এতকাল ভারতের শোষণমোষণ দ্বারা যে বিপুল ঋণ জালে উঁহারা আবদ্ধ হইয়াছেন,এখন তাহার প্রতিশোধের কাল উপস্থিত দেখিয়া নানারূপ টাল্‌মাটাল, ওজর আপত্তি,ছলবাহানা আরম্ভ করিয়াছেন।

আর এক কথা, কাহাকেও সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া অবিরত তাহার দোষাবলী কীর্ত্তন করিলে সেই দোষগুলি ক্রমে নিন্দুকে আসিয়া বর্ত্তে। ধনজনবলদৃপ্ত মদবিহ্বল জনবুল পৃথিবীশুদ্ধ লোককে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে,বিশেষ প্রাচ্যজাতিনিচয়কে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, শঠ, প্রবঞ্চক ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। একারণ উঁহাদের মধ্যে ক্রমে দুষ্টচরিত্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। গর্ব্ব,ধৃষ্টতা,পরাবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া থাকে।

ইংরাজের চিত্তবৈকল্যের অপর একটী কারণ আমাদের তোষামোদ। চাটুবাক্যবাণ প্রয়োগে বড় বড় বারপালোয়ানকেও সহজে খা'ল করা যায়। উহা দ্বারা সর্ব্বদা বিদ্ধ হইলে মেরুদণ্ড আর থাকে না, ব্রহ্মাণ্ড কা'ত হইয়া পড়েন। শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই আমরা লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া "হুজুর" "স্বামিন্" "দীনদুনিয়ার মালিক" "হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে ছাড়ি না। অযথা স্তুতিবাদে স্তাবকের যেমন ক্ষতি, স্তুতেরও ততোধিক, উহা উভয়ের চিত্তকে ভয়ানক তরল করিয়া ফেলে। অবশেষ একপক্ষকে স্ফীত ভেকের দশা পাইতে হয়, আর ততদূর শ্রাদ্ধ না গড়াইলে মস্তিষ্কের ঘোর বিকার ত অবশ্যম্ভাবী।

খোসামোদের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চলিতে পারা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব,—জ্ঞানধর্ম্মে কতক পরিমাণে উন্নত কোন ব্যক্তিকে যদি কেহ হঠাৎ একদিন বলে, "আপনি ত সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার" তিনি হয়ত মনে করিবেন,কথাটা বিদ্রুপাত্মক বা সাধারণ চাটুবাদ। উপর্য্যুপরি এবম্বিধ স্তুতিবাক্য মাত্র একজনের নিকট শুনিলেও কিয়ৎপরিমাণে চিত্তবিকার সম্ভব, কিন্তু ঐরূপ যদি দশবিশ জন ক্রমাগত বলিতে থাকে,তখন স্তুত ব্যক্তির মনে নিশ্চয় দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, "এতলোক যখন বারম্বার এমন কথা বলিতেছে, তখন উহাদের উক্তি কি প্রকারে অগ্রাহ্য করা যায়? আমরই ভ্রম, আমি হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষের মাথা সহজেই বিগড়াইবার কথা, সুতরাং অবশেষে তিনি স্থির করিতে বাধ্য যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তাহার এক পাই কম নহেন। অতঃপর বুঝিয়া লও, তাঁহার কি দশা ঘটিল!

অনেক "গুরু" শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক এইপ্রকার গোলকধাঁদায় পড়িয়া খেই হারাইয়াছেন।

প্র:—আপনি যে কর্ত্তব্য মানে ঋণ বলিলেন, তাহা একটু বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

উ:—ইহা কর্ম্মশাস্ত্রের কথা, ইহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের আইন জানা চাই। যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কর্ম্মশাস্ত্রের মতে সংসার ঋণসম্বন্ধী, অর্থাৎ যে কুহকে সংসারের সবাই অহোরাত্র ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা ঋণদায়, এ দুনিয়া কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কারখানা—বিশাল ব্যবসার স্থান। এখানে আমরা শুধু পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিতে বারম্বার যাতায়াত করিতেছি, এবং এক ঋণ শোধ করিতে আসিয়া আবার নূতন নূতন ঋণ করিয়া যাইতেছি, তাই এই গমনাগমনের শেষ করিতে পারি না। ঋণের জের্ একদম্ না মিটাইতে পারিলে ভববন্ধন ছেদনের উপায় নাই। আমরা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাই, তাহা ঋণপরিশোধের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নতুবা কিসের কর্ত্তব্য? পিতৃঋণ, ধাত্রীঋণ, ভ্রাতৃঋণ, ভগ্নীঋণ, পতিঋণ, পত্নীঋণ, পুত্রঋণ, কন্যাঋণ, আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবগণের ঋণ, রাজার ঋণ, প্রজার ঋণ, প্রভুর ঋণ, ভৃত্যের ঋণ, সেবক সহকারীদিগের ঋণ, সমাজের ঋণ, স্বদেশের ঋণ, সমগ্রমানব-মণ্ডলীর ঋণ, বসুন্ধরার ঋণ, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদির ঋণ, পূর্ব্বপুরুষগণের ঋণ, আচার্য্যাদির ঋণ, দেবতাদের ঋণ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জীবসমূহের ঋণ, বৃক্ষলতা-গুল্মাদির ঋণ;—এক কথায় বিশ্বচরাচরের জড়চেতনোদ্ভিদ্ যাবতীয় পদার্থের নিকট আমরা নানাপ্রকার ঋণে আবদ্ধ হইয়াছি, আরও কতকাল হইব, তাহার ঠিক নাই। আবার এই বিপুল ঋণ প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন,—একাকী আসিয়াছি, একাকী যাইব, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; তবে এত ঋণ কিসের? প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, মোটামুটি দেখিতে একা আসা, সুখ দুঃখ ভোগ করা, একা ভবধাম ত্যাগ করিয়া গমন; কিন্তু আসলে সমগ্র বিশ্বের সবাই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া চলিতে পারে না, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই একত্রে বাঁধা। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, ভ্রূণাবস্থা হইতে দেহান্ত পর্য্যন্ত, সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কত প্রকার লোকের দ্বারা আমাদের শরীর মন আত্মার গঠন, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন ইংরাজ মনীষী যথার্থই বলিয়াছেন,

"The universe is an unbroken chain from God himself to the very dust beneath our feet."

ইউরোপীয়গণও উক্তপ্রকারের ঋণ সমূহ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত কিংস্লী * এক স্থলে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, আমাদের "একা আসা, একা যাওয়া" কথাটা ঠিক নয়, আসিবার সময় ত মাতার দেহের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া আগমন, প্রসূত হওয়ার পর একা থাকিলে বাঁচি কৈ? অতঃপর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েরই জন্য কত লোকের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। আহারীয় দ্রব্যাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, বিদ্যাশিক্ষা, জীবিকা, জ্ঞানধর্ম্মোপার্জ্জন

* Rev. charles Kingsley.

প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত মুখাপেক্ষা না হইয়া চলিবার উপায় নাই। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিকট স্বাতন্ত্র্য-প্রধান পাশ্চাত্য জগতেও এ ধারণা ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, মানুষ অন্য-নিরপেক্ষ হইতেই পারে না।

প্রঃ। কর্ম্মশাস্ত্রের কথা যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহার ব্যবস্থাপিত প্রণালী কিরূপ এবং তদনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিগত ও দেশব্যাপী সুখ দুঃখাদির ভোগ কি প্রকার হইয়া থাকে, একটু বিস্তারিত ভাবে যদি বলেন, তবে ভাল হয়।

উঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "কর্ম্মণো গহনা গতিঃ"—কর্ম্মের গতি গহন অর্থাৎ জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। কর্ম্মরাজ্যের অতীত জীবন্মুক্তাবস্থা না পাইলে কর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, আমরা কেবলমাত্র মোটামুটি গোটাকতক কথা জানিতে সক্ষম। যাহা হউক, যতটুকু পারি, বলিতেছি।

কর্ম্ম শব্দের সাধারণ অর্থ ক্রিয়া, কার্য্য, —যাহা কিছু করা হয়। আমরা প্রতিনিয়ত যাহা করি, তাহার একটা ফল তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই, সেই ফল কার্য্যের গুণানুসারে ভাল, মন্দ বা ভালয় মন্দে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ।

কর্ম্ম ও তাহার ফল বীজাঙ্কুরবৎ এক সূত্রে গাঁথা জানিবে। শাস্ত্রে বলিয়াছে,—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি॥

অর্থাৎ শতকোটী কল্পকাল অতিবাহিত হইলেও কর্ম্মের ফল প্রসবিনী শক্তি তেজোহীনা হয় না। শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। *

যাহা কিছু আমরা মনে মনে ভাবি, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করি এবং যাহা হস্তপদাদি সহকারে নিষ্পন্ন করি, সমস্তই কর্ম্মপদবাচ্য; এরূপেও কর্ম্ম ত্রিবিধ,—মানসিক, বাচিক, কায়িক; আমাদের সর্ব্ববিধ উদ্যমের নামই কর্ম্ম, সেগুলিকে যিনি যখন যেদিক্ দিয়া দেখিয়াছেন, তিনি তেমনি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। কোন পণ্ডিতের দ্বারা ভাবনা, বাসনা, চেষ্টনা, এই তিন প্রকার কর্ম্ম উল্লিখিত। যাহা হউক, পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে কর্ম্মকে তিন থাকে ফেলা হইয়াছে,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মান। এক জন্মের কৃত কর্ম্ম সমূহের অতি অল্প অংশেরই ভোগ সেই জন্মে হয়, বাকী সমস্তই পরজন্ম বা তাহার পর কোন জন্মে ভোগের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। আমাদের এইরূপ অনেক জন্মকৃত বিস্তর সঞ্চিত কর্ম্ম আছে। সেই বিপুল কর্ম্মরাশি হইতে বাছিয়া যেগুলি কোন এক জন্মে ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে জন্মের প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে। আবার প্রারব্ধের মধ্যে পাকা ও কাঁচা, দুই রকম আছে; পাকা প্রারব্ধ হস্তচ্যুত বাণের ন্যায়, উহা হাত ছাড়াইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের এক্তারের সম্পূর্ণ বাহিরে; চেষ্টার দ্বারা কাঁচায় হাত এড়াইতে পারা যায়, কিন্তু সে চেষ্টা একটু বিশেষভাবে প্রবলা হওয়া চাই।

কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা আপাতত

---

* ইংরাজীতেও বলে,—

"Though the mills of God grind slowly,
Yet they grind exceeding small;
Though with patience stands He waiting,
With exactness grinds He all."

থাকুক, পরে কোন সময় হইবে। এখন, আমরা সমস্ত ভারতবাসী যে অতীব শোচনীয় অবস্থায় উপনীত, তৎসম্বন্ধে কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কিছু আলোচনা করা যাউক। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্ম্ম লইয়াই আমরা আত্মান্তর মনে করি, পরন্তু একবারও ভাবি না যে কোন্ কোন্ বিশাল কর্ম্মের সহিত ঐ কর্ম্ম জড়িত,—সমগ্র বিশ্বের কর্ম্ম, এই সৌরজগতের কর্ম্ম, পৃথিবীর কর্ম্ম, ভূখণ্ড বিশেষের কর্ম্ম, স্বদেশের কর্ম্ম, স্বসমাজের কর্ম্ম, স্বপল্লির কর্ম্ম, স্বপরিবারের কর্ম্ম, এতগুলি কর্ম্মের সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মটুকু সমুদ্র মধ্যে একটী সামান্য জলবিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে আর সব থাকুক, কেবল স্বদেশ বা স্বজাতির কর্ম্ম দ্বারা আমরা কি ভাবে পরিচালিত হইতেছি, তাহা দেখা যাউক। যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্মফলে আমরা প্রত্যেকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতি ভোগ করিতেছি, ঠিক সেই প্রণালীতে জাতীয় কর্ম্মফলের প্রভাবে আমাদের উপর দিয়া সুকৃতির স্নিগ্ধ সমীরণ ও দুষ্কৃতির প্রবল ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে। এস্থলে জাতীয় বলিতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি কোন সংকীর্ণ সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় বুঝিতে হইবে না, সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীকে ভারতবর্ষীয় জাতির অন্তর্গত জানিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয়বিধ কর্ম্মই সমান ভাবে দুর্ব্বোধ্য। কুখাদ্য উদরস্থ করিবামাত্র কদাহারজনিত শারীরিক পীড়া অনুভব করা যায় না। কখন এক দিন, কখন দুই দিন, কখন দশবিশ দিন পরে তাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। কবে কোন্ কদর্য্য সামগ্রী ভোজন করিয়াছি, কে মনে করিয়া রাখিতে পারে? এজন্য অনেক সময় হঠাৎ উদরের পীড়া উপস্থিত হইলে মনে হয়, বিনা হেতুতে এরূপ কেন হইল? কিন্তু বাস্তবিক উহার কারণ বহুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হইয়া রোগাক্রান্ত হইতে হইয়াছে। ওরূপ ক্ষেত্রে যেমন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া দৈহিক বিপদকে আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্বজন্মকৃত স্বকীয় ও জাতীয় কর্ম্মফল-জনিত বিঘ্নবিপত্তি সমূহকেও তদ্রূপ অসঙ্গত বোধ করিয়া আমরা অদৃষ্টকে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হই এবং সময়ে সময়ে বিধাতাকে তিরস্কার করিতেও ছাড়ি না। এই যে আমাদের দেশে অধুনা সর্ব্বদাই শুনা যায়, গৌরাঙ্গহস্তে, কৃষ্ণকায়দিগের নানাবিধ অপমান, লাঞ্ছনা, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, এমন কি, তনুত্যাগ পর্য্যন্ত, আবার তদুপরি রাজপুরুষগণের অনুগ্রহে ঐ সকল ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়া জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা আনিতেছে,—এসব কাণ্ড কি কোন খামখেয়ালী আসুরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত, না কোন পরমদয়ালু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিশালী, ন্যায়বান প্রভুর সুশাসনাধীনে সংঘটিত হইতেছে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও কোন সন্তোষজনক সমীচীন কারণ দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, সমস্তই দারুণ কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন অন্যায় অত্যাচার অবিচারের অপ্রতিহত প্রবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তত্রাচ বুঝিতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অন্তরালে সামঞ্জস্য আছে, বিধাতার ন্যায়দণ্ড-তথায় সপ্রতাপে কার্য্য করিতেছে, সুতরাং বিশিষ্ট কারণ সমূহ বিদ্যমান। জগৎপতি সর্ব্বদর্শী ন্যায়াধীশ, তাঁহার সুবিশাল বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সুনিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে

চলিতেছে, বুত্রাপি ব্যভিচারের তিলমাত্র সম্ভাবনা নাই, পক্ষপাত দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; এবং সদা জাগ্রত—কস্মিন কালে বিরাম, বিশ্রাম, অবসর জানেন না। এবম্বিধ অবস্থায় আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কিছু বিশ্বাস করা যায় কি? কোন ব্যাপার বিনা কারণে ঘটিল, ইহা কি প্রকারে মনে স্থান পাইতে পারে? ইংরাজ কবি পোপ অতিসুন্দর যথার্থ কথায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উচ্চ বিজ্ঞানানুমোদিত :—

"All nature is but art unknown to thee,
All chance direction which thou canst not see,
All discords harmony not understood,
All partial evil universal good"—Pope.

জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, প্রকৃতিতে কোথাও কোন বিষয়ে অনিয়ম দৃষ্ট হয় না,—বিনামেঘে বজ্রাঘাত বলিলে কেহ বিশ্বাস করে না, কারণ সবাই জানে, মেঘের সঙ্গেই বজ্রাঘাত সম্ভব, মেঘ ব্যতীত বজ্রের সম্ভাবনা স্বভাবের কঠোর নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং আকাশকুসুমবৎ অলীক। জড়রাজ্যের সর্ব্বত্র সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা, আর সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার মানব-পরিবারের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, উন্নতি অবনতির বেলায় তাহাদের ক্ষমতা বাহিরে যা-ইচ্ছা-তাই ঘটিতেছে, কোন নিয়ম নাই, কোন ব্যবস্থা নাই, কোন বিচার নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই, ইহা বাতুলের পক্ষেও অবিশ্বাসযোগ্য।

এই যে ইংরাজজাতি দেখিতেছ, খুব সম্ভব ইঁহারা বহুকাল পূর্ব্বকার ভারতবর্ষীয় আদিম অনার্য্যসমূহ, নানাজন্ম ভোগ করিয়া অধুনা বৃটনে আবির্ভূত। আর্য্যেরা এদেশে আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিবার সময় ঐ সকল অসভ্য বর্ব্বর শ্রেণীর জীবগণের প্রতি যে উপদ্রব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারই এখন প্রতিশোধ চলিতেছে। আমরা তখনকার অত্যাচারী, এখন বিপক্ষপদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছি। হয়ত সময়ে সময়ে প্রতিশোধের মাত্রা একটু বেশী হইয়া পড়িতেছে, তাহা হইবারই কথা, ফাজিলটা ক্রিয়মানের মধ্যে ধরিতে হইবে। এই প্রকারে জন্মজন্মান্তরে কখন গাড়ীর উপর নৌকা, কখন নৌকার উপর গাড়ী দেখা গিয়া থাকে। যে সময় আমরা এদেশে অধিকার করিয়া অধিবাসী অনার্য্যদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলাম, তখন আমাদের খেয়াল ছিল না যে অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তির যাতনাসমূহ অত্যাচারীর বলবিক্রমের গুপ্তভাবে ক্ষয় সাধন করে, ইহা বিধাতার মঙ্গলবিধান। এ সকল কথা বুঝিতে হয়ত তোমাদিগকে একটু বেগ পাইতে হইতেছে। ভাল, কোন সময় ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। এখন অন্য প্রশ্ন করিতে পার।

প্র :—বিধাতার বিধানে অধুনা ইংরাজ আমাদের দেশের অধীশ্বর, তাঁহাদের শাসন-প্রণালী আইনকানুন উৎকৃষ্ট, কথাবার্ত্তা বক্তৃতা উপদেশ উদার ও শ্রুতিমধুর। স্বয়ং সম্রাট্ অভয়দান করতঃ ঘোষণা প্রচার করিতেছেন,—শ্বেতকৃষ্ণ জেতৃজিতে কোন প্রকার প্রভেদ না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সমগ্র সাম্রাজ্য সুশাসিত হইবে। সবই দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল; ছাপাকাগজ পড়িতেও ভাল; বাহিরের লোকের মনে হয় বৃটিশ-ভারতের প্রজার নিকট স্বর্গসুখও তুচ্ছ। পরন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ এরূপ ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ ইংরাজজাতিও সব সময় কথায় কাজে সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। ইহার কারণ কি?

উঃ—উঁহারা মানুষ বৈত দেবতা ন'ন। স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পক্ষপাতদোষ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ঠিক পথে চলিতে দেয় না। যে শ্রেণীর মোহবশতঃ ইংরাজরাজ-পুরুষদিগকে মধ্যে মধ্যে নিজেদের অঙ্কিত সরল পথ ত্যাগ করিয়া বক্রগতি হইতে হয়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ত বটেই। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে। বিবেকী বৈরাগী পুরুষ ভিন্ন সাংসারিক মোহ অতিক্রম করিয়া চলা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ইংরাজ যদি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কেবলমাত্র পরার্থপরতার অনুরোধে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকিতেন, অবশ্য আমরা তাঁহাদিগকে দুনিয়াদারী-মোহের অতীত মনে করিয়া তাঁহাদের কথা ও কাজে অমিলের আশঙ্কা আদৌ করিতাম না, কিন্তু তাহা ত নয়। উঁহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক স্বার্থের বশীভূত হইয়া সাত-সমুদ্র-তের নদী পারে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং যেখানে তাঁহাদের কোন রূপ স্বার্থে ব্যাঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, সেখানে তাঁহারা সাধারণ দুনিয়াদারী নিয়মের বশীভূত হইয়া এদিক ওদিক করিতে বাধ্য হন। তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাংসারিক জীব এ প্রকার ভিন্ন আর কি করিয়া থাকে? আমরা নিজেরা এরূপ অবস্থায় কি করিতাম? আমরা আপনাদিগকে ইংরাজের অবস্থায় ফেলিয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করি, দেখিতে পাই যে, সম্ভবতঃ আমরা ঠিক অতখানিই করিতাম, বরং কিছু বেশী। একটু বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যে আজকাল প্রচণ্ড আইনাদি বিধিবদ্ধ হইতেছে, অতি কঠোর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, আমরা উঁহাদের অবস্থায় পড়িলে ঠিক ঐরূপই করিতাম। সুদূর ইংলণ্ড হইতে মুষ্টিমেয় ধবলকায় আসিয়া আল্‌গোছে বসিয়া ত্রিশকোটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির কালা-আদমীর উপর হুকুম চালাইতেছেন, শাসিতের কথাবার্ত্তা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, হাবভাব কিছুই বুঝেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না, সব রকম সংবাদের জন্য তাহাদের মুখের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহারা সাপ-বেঙ যেমন বুঝাইয়া দিবে তেমনি বুঝিতে হইবে, এক্ষেত্রে নিজেদের গুণাগুণ ভাবিয়া দেখ, যাহা যাহা ঘটিতেছে, ঠিক কি না। আমরাই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনোদ্দেশে রাজপুরুষদের কাণে নানা ভয় বিপদের কথা অতিরঞ্জিতভাবে তুলিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, আপনাদের মতলব হাসিল করিবার চেষ্টায় আছি, তাহাতে প্রজার কষ্টই বাড়ুক, দেশময় অশান্তিই হউক, আর বিস্তর নিরীহ লোকই মারা যাউক, কাহার কি? এই ত অবস্থা!!!

প্রঃ—যখন পারিবেন না, তখন ওরূপ আশাপ্রদ বাক্যসমূহ প্রচার না করিলেই ত ভাল হইত।

উঃ—লম্বা কথার উপর ত কোন প্রকার টেক্স নাই। তারপর বাস্তবিক ইংরাজজাতির প্রকৃতিতে ন্যায়পরায়ণতা পূর্ব্বে কিছু ছিল, তাঁহারা সরল মনে নিজেদের ক্ষমতা না মাপিয়া উচ্চবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চকথা প্রচার করিয়াছেন, পরে বিশেষ বিশেষ স্থলে যে উঁহা রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন, ইহা তখন ভাবিতে পারেন নাই; হয়ত অদূরদর্শিতাবশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, পরীক্ষার ক্ষেত্র কখন উপস্থিত হইবে না।

প্রঃ—যখন মানুষ কোন কালেই স্বার্থ-

পরতাব হাত এড়াইতে পারে না, তখন ইংরাজের হাতে কি আমাদের কোনই আশা নাই? অনন্তকাল কি আমাদিগকে এইভাবে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত হইতে হইবে? পৃথিবীর ধ্বংস পর্য্যন্ত কি ঈশ্বর গালে হাত দিয়া বসিয়া হতভম্বভাবে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিতে থাকিবেন?

উঃ—তাহা কখনই হইতে পারে না। যে ঘটনাগুলিকে আমরা আপাততঃ উপদ্রব অত্যাচার বলিয়া মনে করিতেছি, বাস্তবিক ওগুলির ভিতর গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আবার সেই পুরাতন কথা বলিতে হয়,—সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত সাধুরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, প্রচার করিয়া আসিতেছেন,—জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গল সম্ভবে না। সুতরাং এরূপ না বুঝিয়া উপায় নাই যে, যাহা কিছু আমরা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, আকস্মিক বিপদ-আপদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, সে সমুদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিতেছে, আপাততঃ কটুবোধ হইলেও বিকট তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে হিতকারী। বিধাতার আদেশে তাহার কল্যাণকর নিয়মেই ওরূপ ব্যাপার সমূহ সংঘটিত হইতেছে, কাল পূর্ণ হইলে ওভাবে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ঈশ্বর চিরকাল এক গুলিতে দশ চিড়িয়া মারিয়া থাকেন, তিনি বড় মিতব্যয়ী। যাহারা অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং উৎপীড়িতের উষ্ণ নিশ্বাস ও তপ্ত অশ্রুর তেজে তাঁহাদের বলবিক্রম ক্ষয় হইয়া আসিবে, আমরাও দুষ্কৃতি বশতঃ অত্যাচারের কুফল ভোগ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া কাতর প্রাণে বিপত্তির মধুসূদন শ্রীহরির চরণ প্রান্তে লম্বা হইয়া পড়িব; উপর হইতে ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পরস্পরের প্রতি ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া সুমিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়াইবে। কোন্ কোন্ পথ দিয়া উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা এখন লোকচক্ষুর অগোচর। তবে এমনও হইতে পারে যে, ক্রমান্বয়ে অন্যায় অত্যাচার করিতে করিতে উৎপীড়নের ভীষণ ভাব এত উগ্র হইয়া উঠে যে, উৎপীড়ক নিজে তাহার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, ঐ সকল ভগবদ্বিরোধী কার্য্যের দ্বারা তাঁহার হৃদয়রাজ্যে কি ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এবম্বিধ প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার উন্নতি হয়। অপরপক্ষে উৎপীড়িত নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করত মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। চরমে উভয়েরই কল্যাণ হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ।*

দর্শন শাস্ত্র পাঁচ ফুলের সাজী নহে। পাঁচটী ভাল ভাল মত একত্র করিয়া এক খানা পুস্তক লিখিলেই তাহা "দর্শন শাস্ত্র" আখ্যা লাভ করে না। আবার পাঁচটী

* শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতামত সমালোচিত হইল।

মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটা নূতন গ্রন্থ রচনা করিলেই যে তাহা দর্শন-শাস্ত্র হইবে, তাহাও নহে। দর্শন শাস্ত্র একটী মহান বৃক্ষ। একটী অণুপরিমাণ বীজই যেমন পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষের আকারে বিকশিত হয়, তেমনি একটী বীজ সত্যই বিকশিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দর্শনের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা এভাবে দর্শন রচনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মতামত জগতে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না। দর্শন জগতে শঙ্করের স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার মতামত 'জোড়াতালি' দেওয়া ব্যাপার নহে, তিনি একটী বিশেষ সত্যকে বীজ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া একটী দর্শন রচনা করিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাউক, এই বীজ সত্যটী কি।

বীজ-সত্য।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই শঙ্কর-দর্শনের বীজ সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে (২।১) শঙ্কর ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে অনূদিত হইল,—

"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, 'সত্য' শব্দের অর্থ কি? যাহা যেরূপে নিশ্চিত, তাহার যদি সেই রূপের ব্যভিচার না হয়, তবেই তাহা সত্য (যৎ রূপেণ যৎ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎসত্যম্)। সুতরাং 'ব্রহ্ম-সত্যম্' ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অনেক সময়ে জড় বস্তুকেও অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকিতে দেখা যায়। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করেতে পারেন, ব্রহ্ম হয়ত মৃদ্বৎ 'অচিৎ'। এই আশঙ্কায় বলা হইল, ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্' অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। লৌকিক জ্ঞান সীমা বিশিষ্ট: 'জ্ঞান' বলিলে লোকে সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানের কথাই ভাবিয়া থাকে। 'ব্রহ্মজ্ঞানম্' এই কথা শুনিয়া লোকে ভাবিতে পারে, ব্রহ্ম বুঝি সীমা বিশিষ্ট জ্ঞান। এই জন্য বলা হইল, ব্রহ্ম 'অনন্তম্'। শ্রুতিতে (ছাঃ উঃ ৭।২৪।১) অনন্ত বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে, —"যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ অনন্ত, আর যেখানে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহাই অল্প। সুতরাং যিনি অনন্ত, তাঁহার অংশ থাকিতে পারে না।

"জ্ঞান শব্দের অর্থ 'জ্ঞপ্তি', অববোধ। জ্ঞান—জ্ঞা ধাতু ল্যুট (ভাববাচ্যে)। কেহ কেহ বলেন, এখানে জ্ঞান অর্থ 'জ্ঞানবান' বা 'জ্ঞাতা'। এ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে, 'জ্ঞান শব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, কিন্তু 'জ্ঞাতা' শব্দ কর্তৃ বাচ্যে নিষ্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ যেখানে জ্ঞান—কর্তৃত্ব, সেইখানেই কার্য্য, বিকার ও পরিবর্ত্তন। সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে বিকার-বিহীন ব্রহ্মে বিকার স্বীকার করা হয়। তৃতীয়তঃ—আত্মায় যখন ভেদ নাই, তখন আত্মাতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, (স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাৎ বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ)। যদি ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বল, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করা হয়। ইহাতে ব্রহ্মের অনন্তত্বে আঘাত পড়ে, কারণ যেখানে অন্য কিছু দেখা যায়, তাহাই সীমাবিশিষ্ট। সুতাং ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যায় না।"

"কেহ কেহ আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম দ্বিতীয় বস্তু না জানিতে পারেন, কিন্তু তিনি ত নিজেকেই জানিতে পারেন—তাহার ত আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে। না, এ প্রকারও বলা যায় না। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বস্তু, সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে তুমি

জ্ঞাতা বলিতেছ। তিনি যদি জ্ঞাতা হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাতারূপেই অবস্থিত আছেন। তিনি যখন জ্ঞাতৃরূপে অবস্থিত, তখন তিনি আর জ্ঞেয়রূপে অবস্থান করিতে পারেন না। যদি বল, একই আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয় রূপেই অবস্থিত, তাহা হইলেও দোষ হয়। ব্রহ্মের যদি অংশ থাকিত, তাহা হইলে এক অংশকে জ্ঞাতা এবং অপর অংশকে জ্ঞেয় বলিতে পারিতে। কিন্তু ব্রহ্ম যখন অংশবিহীন, তিনি যখন নিরবয়ব, তখন তাঁহাকে যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই বলিতে পার না (ন যুগপৎ অনংশত্বাৎ) সুতরাং 'জ্ঞানম্ ব্রহ্ম' এই অংশ দ্বারা ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি করিতে অস্বীকার করা হইল।" ('জ্ঞানং ব্রহ্মেতি কর্ত্তৃত্বাদি কারক নিবৃত্যর্থম্ ইত্যাদি)।

এখানে বলা হইল, ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার অংশ বা অবয়ব নাই, তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, কর্ত্তৃত্বাদি ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না।

ব্রহ্মাবস্থা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, 'মানব প্রতিদিন সুষুপ্তাবস্থাতে সৎস্বরূপের সহিত একীভূত হয়—সে তখন আপনাকে প্রাপ্ত হয় ৬।৮।১। অপর এক স্থলে লিখিত আছে "মনে কর পৃথিবী গর্ভে সুবর্ণ নিহিত আছে। কিন্তু মানুষ যদি সুবর্ণের কথা না জানে, তাহা হইলে উপর্য্যুপরি এই ভূমির উপর বিচরণ করিলেও সে জানিতে পারে না যে নিম্নে সুবর্ণ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তেমনি যদিও মানব প্রতিদিনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত করিতেছে, তবুও অসত্য দ্বারা চালিত হইয়া ইহা জানিতে পারিতেছে না" ৮।৩।২১। শঙ্কর বহু স্থলে (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪, ১।১৫।১৬, গীঃ ভাঃ ১৩।২, বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৩।৪।১ ইত্যাদি) এই দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষুপ্ত অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। এক স্থলে লিখিয়াছেন "প্রগাঢ় সুপ্ত পুরুষ দেখিলে লোকেও বলিয়া থাকে, এব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়াছে, এব্যক্তি ব্রহ্মে গমন করিয়াছে" বেঃ ভাঃ ১।১৫।১৬।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এবং ইহার শাঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে যে, তুরীয় অবস্থা সুষুপ্ত অবস্থা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। মানুষ সুষুপ্তাবস্থা হইতে প্রত্যাগত হইয়া জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় অবস্থা হইতে কাহারও প্রত্যাগমন সম্ভব নহে। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থা কার্য্যকারণ সংযুক্ত, কিন্তু তুরীয় কার্য্য কারণ-বদ্ধ নহে (প্রাজ্ঞস্তু কারণ বদ্ধঃ, ন কার্য্য কারণবদ্ধঃ তুরীয়ঃ গৌঃ পাঃ ভাঃ ১।১৪)। নতুবা বাহ্যতঃ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থা কি প্রকার, তাহা শঙ্কর বহু স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১)

এই সুষুপ্ত অবস্থাতে পুরুষ প্রজ্ঞাত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অন্তর বা বাহ্য কিছুই জানে না। ইহাই ইঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকরহিত অবস্থা। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, দেব অদেব, এবং বেদ অবেদ হয়েন। এই অবস্থাতে স্তেন (=চোর) অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হয়েন। এই অবস্থাতে পুণ্য ইহার অনুগমনকরে না। ,পাপও ইহার অনুগমন করে না। তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

এই অবস্থাতে তিনি দর্শন করেন না, দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। দর্শন করেন, এরূপ বলিবার কারণ এই যে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না। দর্শন করেন না, এরূপ বলিবার কারণ এই যে আত্মা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই,যাহা তিনি দর্শন করিবেন। এই প্রকার আত্মার পক্ষে ঘ্রাণ করা, আস্বাদন করা, শ্রবণ করা, বলা, মনন করা, স্পর্শ করা ও জানা, সম্ভব নহে। এই আত্মাকে শ্রোতা, মন্তা, জ্ঞাতাদি বলিতে পার, কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় অবিভক্ত বস্তু নাই, যাহা আত্মা জানিতে, শুনিতে, আঘ্রাণ ও আস্বাদন করিতে পারেন। যেখানে অন্য কোন বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, তখন এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে বলিয়া থাকে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ ও এক অপরকে অবগত হয়। কিন্তু এই সলিল (অর্থাৎ সলিলের ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্যভেদ-রহিত আত্মা) এক ও অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। ইহাই ব্রহ্মত্ব। বৃঃ উঃ ।৪।৩। শঙ্করাচার্য্য এই অংশের বিস্তীর্ণ ভাষ্য লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। ভাষ্যকার বিভিন্ন স্থলে বহুবার এই সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(২)

অন্য এক স্থলে উপনিষদে ব্রহ্মাবস্থার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে, "যতক্ষণ দ্বৈত, এইরূপ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ এক অন্যকে দর্শন করে, এক অপরকে ঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে মনন করে, এক অন্যকে স্পর্শ করে, এক অন্যকে জানে, কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কি উপায়ে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে জানিবে? বৃঃ ২।১।১৪।

(৩)

মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেনঃ—

"রাত্রিতে নৈশ অন্ধকারে যেমন সমুদয় বস্তু অবিভক্ত ঘনাকার হয়, প্রজ্ঞানঘনও তেমনি।" ৫।

(৪)

এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বলা হইল, ব্রহ্ম একাকার। তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ বর্ত্তমান নাই। এই প্রকার কথা বহুস্থলে রহিয়াছে, নিম্নে আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আশ্রয় ও জগৎকে আশ্রিত বলা হইয়াছে এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও জগতের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ইহাতে এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে যে,বৃক্ষ যেমন এক হইলেও শাখা, স্কন্ধ ও মূল প্রভৃতি বশতঃ নানাত্ব পূর্ণ, তেমনি আত্মাও বুঝি 'নানা রস' ও 'বিচিত্র।' এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "এই আত্মাকে একই রূপ বলিয়া জানিবে।"এখানে বলা হইতেছে যে,আত্মাকে কার্য্যরূপী প্রপঞ্চ বিশিষ্ট বিচিত্র বলিয়া মনে করিও না।" তবে কি ভাবে জানিবে?— "বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাজনিত জগৎ প্রপঞ্চকে লয় কর। লয় করিয়া সেই আয়তনভূত

এক আত্মাকে 'একরস' বলিয়া অবগত হও।" বেঃ ভাঃ ১।৩।১।

'প্রপঞ্চ বিলয়' অর্থ কি, শঙ্কর অন্যত্র (৩।২।২১) তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অগ্নির উত্তাপে ঘৃতের কাঠিন্য যেমন বিলীন হইয়া যায়, প্রপঞ্চবিলয় সে প্রকার নহে। কারণ এ প্রকার বিলাপন অসম্ভব। যাহার চক্ষুর তিমির রোগ হইয়াছে, সে এক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া দেখে। এই তিমির রোগ যখন বিদূরিত হয়, তখন বহু চন্দ্র আপনা আপনিই বিলীন হইয়া যায়। প্রপঞ্চ বিলীন অর্থও ঠিক এই প্রকার। এই জন্যই শঙ্কর উক্ত ভাষ্যেরই শেষ ভাগে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম ক জ্ঞানগোচর করাইলে বিদ্যা আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইবে, এবং সেই বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বিদূরিত হইবে। তখন অবিদ্যা-ধ্বস্ত এই নামরূপ প্রপঞ্চ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। বেঃ ভাঃ ৩।২।২০।

কি অর্থে ব্রহ্ম 'একরস', এখানে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইহাতে ভেদগন্ধ বিন্দুমাত্রও নাই—ইনি একাকার*।

(৫)

শঙ্কর অন্য একস্থলে বলিয়াছেন—"শ্রুতি-তেও বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, নির্ব্বিশেষ, ইহাতে কোন মাত্র রূপ নাই। "যেমন সৈন্ধব খণ্ড অন্তর ও বাহ্যরহিত, এবং এক মাত্র রসঘন, তেমনি এই আত্মাও অন্তর ও বাহ্যরহিত এবং একমাত্র চৈতন্যঘন। ইহাতে বলা হইল, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই এবং চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন রূপ নাই; তিনি, অন্তর-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই, ইহার স্বরূপ। যেমন সৈন্ধবখিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে এক-মাত্র লবণরস, ইহাতে অন্য কোন প্রকার রস নাই, ব্রহ্মও তেমনি" বেঃ ভাঃ ৩।২।১৬।

---

* কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন "কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্কর মতে নানাত্ব একবারে অলীক বা মিথ্যা। এইরূপে শঙ্করের উপর কতজনে কত অবিচার করিয়াছে" নব্যভারত পৃ ৫৭৬।১৩১৪ ফাল্গুন। 'উপনিষদের উপদেশ' দ্বিতীয় খণ্ডও লিখিয়াছেন—"পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলেও এই সসাগরা বনশৈলা মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া যায় না। জগৎ জগৎই থাকে, শক্তি শক্তিই থাকে। ইহাই শঙ্করের মত"। পৃ ১৩০।

ইহাকেই বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'। পাঠকগণ (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬) অংশের সহিত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখিবেন। প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়, অথচ জগৎ নাকি জগৎই থাকে।

পরমার্থ জ্ঞান জন্মিলেই যে যে প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়, তাহা নহে। এই জগৎ সর্ব্ব সময়েই অস্তিত্ববিহীন। শঙ্কর এ বিষয়ে এই প্রকার আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, প্রপঞ্চ নিবৃত্তি হইলে অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই প্রপঞ্চের যদি নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর এই—প্রপঞ্চ যদি বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু রজ্জুতে যেমন সর্প কল্পিত হইয়া থাকে, তেমনি এই প্রপঞ্চও ব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং এই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই। ইহা যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে ইহা বিদূরিত করা সম্ভব হইত। ভ্রান্তি বুদ্ধি বশতঃ রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। (সর্পই যখন বিদ্যমান নাই তখন) বিবেক দ্বারা এ সর্পের নিবৃত্তি করা সম্ভব নহে। তেমনি মায়াবী কর্তৃক যে মায়া প্রসারিত হয়, তাহার অস্তিত্ব নাই। (মায়ারই যখন অস্তিত্ব নাই তখন) দর্শকদিগের চক্ষু মায়ামুক্ত হইলে মায়া নিবৃত্ত হইবে, ইহাও হইতে পারে না। সেইরূপে দ্বৈত প্রপঞ্চও মায়ামাত্র। রজ্জুর ন্যায় কিম্বা মায়াবীর ন্যায় পরমার্থতঃ অদ্বৈতই সত্য। সুতরাং প্রপঞ্চের উৎপত্তি বা বিলয় কিছুই নাই (গৌঃ পাঃ কারিকা ভাষ্য ১।১৭।)

পর প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

(৬)

ব্রহ্ম কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য 'সৈন্ধবঘন' 'একরস' 'সলিল' ইত্যাদি নানা প্রকার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও একটী শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টান্ত আছে। সেটী আকাশের দৃষ্টান্ত। আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই এক প্রকার, ইহাতে যেমন কোন প্রকার বিচিত্রতা নাই, কোন প্রকার ভেদ নাই—ব্রহ্ম ঠিক সেই প্রকার। (গীতাঃ ভাঃ ১৩।২৯ বা ৩০)।

ব্রহ্মাবস্থা কি প্রকার, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। সুষুপ্তাবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। এবং ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তাঁহার রূপের কখন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্যই সুষুপ্ত আত্মার ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্য-ভেদবিহীন। পরমাত্মা নিত্যই স্বগত ভেদবিহীন অবস্থায় বিরাজমান। ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। একথা আমাদের সিদ্ধান্ত নহে। শঙ্কর নিজেই ইহা বলিয়াছেন।

(১)

গীতা-ভাষ্যে বলা হইয়াছে "আত্মার অবস্থা ভেদ স্বীকার করা যায় না"—আত্মনোঽবস্থা ভেদানুপপত্তেঃ * (১৩।৩)।

* বিদ্যারত্ন মহাশয় শঙ্করের নামে কি প্রচার করিতেছেন, শ্রবণ করুন—"সগুণ ব্রহ্মও প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের একটী অবস্থান্তর মাত্র" উপনিষদের উপদেশ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৬। নব্যভারতেও লিখিয়াছেন, "নির্গুণ ব্রহ্মেরই উহা (সগুণ ব্রহ্ম) আগন্তুক অবস্থাভেদ মাত্র" পৃঃ ৩৫৮, ১৩১৪ সাল। শঙ্কর যাহা বলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিক তাহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই পরে (২) সংখ্যক অংশে শঙ্করের ঐ যুক্তি তর্ক উদ্ধৃত হইল।

(২)

শঙ্কর বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"কেহ কেহ বলেন "পরব্রহ্ম অচঞ্চল মহাসমুদ্রের ন্যায়। ইহারই ঈষৎ চঞ্চল অবস্থাকে অন্তর্যামী (খণ্ডব্রহ্ম) এবং অত্যন্ত চঞ্চল অবস্থাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ আবার ব্রহ্মের পঞ্চাবস্থা (পিণ্ড, জাতি, বিরাট, সূত্র ও দৈব) কেহবা অষ্টাবস্থা (পিণ্ড, জাতি, বিরাট, সূত্র, দেব, অব্যাকৃত, সাক্ষী ও ক্ষেত্রজ্ঞ) কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ বলেন, এ সমুদয় ব্রহ্মের শক্তি, কারণ ব্রহ্মকে অনন্তশক্তি বলা হয়। কাহারও কাহারও মতে এ সমুদয়ই ব্রহ্মের বিকার। এ সমুদয় আপত্তির উত্তর এই :—'—এই সমুদয় ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে (অবস্থা—শক্তী তাবৎ না উপপদ্যেতে) *। কারণ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর পুরুষ অশনায়াদি সংসার ধর্ম্মের অতীত। এখন যদি ব্রহ্মে অশনায়াদি ধর্ম্ম আরোপ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সংসারধর্ম্ম রহিত ও সংসার ধর্ম্মযুক্ত, উভয়ই বলা হয়, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মের শক্তিত্রয় সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য (তথা চ শক্তিনয়ঃ)। এই সমুদয়কে ব্রহ্মের অবয়ব বা বিকার * *

* শঙ্করাচার্য্য এখানে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সগুণ ব্রহ্মাদি নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তিও নহেন এবং অবস্থা বিশেষও নহেন। কিন্তু বিদ্যারত্ন বলিতেছেন যে, শঙ্করের মতে "সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মেরই শক্তি সম্বলিত অবস্থা বিশেষ"। নব্যভারত পৃ ৩৫৮, ১৩১৪ সাল।

* কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, শঙ্করের মতে "ব্রহ্মই বস্তুতঃ জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন" নব্যঃ পৃ ৪৬০।

বলিলে কি দোষ হয়, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সুতরাং এ সমুদয় কল্পনা অসত্য। (তস্মাৎ এতাঃ অসত্যাঃ সর্ব্বাঃ কল্পনাঃ)। বৃহঃ ভঃ ৩৮।১২।

পরমাত্মার সহিত সগুণ ব্রহ্ম জীবাত্মা প্রভৃতির কি সম্বন্ধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত অংশে প্রমাণিত হইল ব্রহ্মের 'অবস্থা ভেদ' স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি সর্ব্বসময়েই একই ভাবে বর্ত্তমান।

কার্য্য ও কারণ।

ব্রহ্ম যখন নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা, এবং যখন তিনি সমুদয় ভেদরহিত, তখন তাঁহাতে কর্তৃত্বাদি কারক অর্পণ করা যায় না। এই জন্যই প্রশ্নভাষ্যে (৬।৩)। শঙ্কর বলিয়াছেন "ব্রহ্ম কর্তৃত্ব,* ভোক্তৃত্ব, কিম্বা ক্রিয়া,কারক বা ফল কিছুই নাই। 'কারক' কথাটার ব্যাখ্যা আবশ্যক। কর্ত্তাকর্ম্ম-করণ, অপাদান, অধিকরণাদিকে কারক বলে। ব্রহ্মে এই প্রকার কারক নাই। ব্রহ্ম কোন কার্য্য করেন না, সুতরাং তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। তিনি কোন ক্রিয়ার কর্ম্মও নহেন। ব্রহ্মদ্বারা কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, সুতরাং তিনি করণও নহেন। ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তিনি অপাদান নহেন। ব্রহ্ম কোন বস্তুর আধারও নহেন। এই জন্যই শঙ্কর বহুস্থলে ব্রহ্মকে ক্রিয়া ও কারকাদি বর্জ্জিত বলিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ২।১।১৪ গীঃ ভাঃ ১৩।২,বৃঃ ভাঃ ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৪।৪।১ ইত্যাদি।

ব্রহ্মে কার্য্য-কারণ ভাব নাই এবং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুও নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, 'কার্য্যকারণ' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

গৌড়পাদীয়কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর ঠিক এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। কারিকাতে নিম্ন লিখিত উক্তিটী পাওয়া যায় ঃ—

"অসৎ কখন অসতের কারণ হইতে পারে না এবং অসৎ সতেরও কারণ হইতে পারে না। সৎও কখন সতের কারণ হইতে পারে না, সৎ অসতের কারণ হইবে কি প্রকারে? ৪।৪০।

শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকারেই কোন বস্তুরই কার্য্য কারণভাব প্রতিপন্ন হয় না।* প্রশ্ন হইতে পারে, কেন প্রতিপন্ন হয় না? তাহার উত্তর এই—অসত্য কখন অসত্যের কারণ হইতে পারে না—যেমন শশবিষাণ খ-পুষ্পাদির কারণ নহে। সেই প্রকার

অধিকাংশ স্থলেই কোকিলেশ্বর বাবু এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন "নির্গুণ ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা,একথা শঙ্কর বারম্বার বলিয়াছেন, নব্যভারত কার্ত্তিক পৃঃ ৩৫২, ১৩১৪ সাল। 'সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম" নামক প্রবন্ধে পরে ইহার সম্যক আলোচনা করা যাইবে।

* শঙ্কর কোন প্রকার কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করেন না, সুতরাং জগৎ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টৃত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন :—"অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে, শঙ্কর সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মায়াময় ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইহাও নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। শঙ্করের তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই শঙ্করের নামে এই সকল অন্যায় কথা বলিয়া বেড়ান" উপনিষদের উপদেশ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৫। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'বিশ্বাস' যে, 'অন্ধ বিশ্বাস' তাহা পর প্রবন্ধে আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইবে।

অসৎবস্তুও সৎবস্তুর কারণ নহে—যেমন শশ বিষাণাদিকে ঘটাদির কারণ বলা যায় না। সৎ বস্তুও সৎবস্তুর কারণ নহে, যেমন ঘটাদি বস্তু অন্য ঘটাদির কারণ হইতে পারে না। আর সৎবস্তু অসৎবস্তুর কারণ কি প্রকারে হইবে? অন্য প্রকার কার্য্যকারণ ভাব থাকা বা কল্পনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং বিবেকীগণের নিকটে কোন বস্তুরই কার্য্য কারণ ভাব নাই।

গৌড়পাদাচার্য্যের আর একটী শ্লোক এই:—

একটী বস্তু অন্য একটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না এবং নিজ হইতেও নিজের উৎপত্তি হইতে পারে না। সৎই হউক, বা অসৎই হউক বা সদসৎই হউক, কোন বস্তুরই উৎপত্তি নাই। ৪।২২।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য এই:—কোন বস্তুরই উৎপত্তি নাই। যে বস্তুকে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা নিজ হইতে বা পর হইতে বা উভয় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা 'সৎ'ই হউক, বা 'অসৎ'ই হউক 'সদসৎ' (অর্থাৎ, একাধারে সৎ ও অসৎ উভয়)ই হউক, ইহার উৎপত্তি নাই। কোন উপায়েই ইহার জন্ম সম্ভব নহে। যে বস্তু স্বয়ং অনিষ্পন্ন, সেই বস্তু হইতে—স্বতঃ স্বরূপ হইতে স্বয়ং সেই বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন একটী ঘট সেই ঘট হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—একটী বস্তু অপর কোন বস্তু হইতেও উৎপন্ন হয় না; যেমন ঘট হইতে পট বা পট হইতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ—একটী বস্তু নিজ কিম্বা অপর—এতদুভয় হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ ইহা বিরোধী কথা,—যেমন ঘট ও পট এতদুভয় হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না, পটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। বলিতে পার, মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সত্য, মূর্খলোকেই প্রত্যয় করে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং এজন্য তাহারা অনুরূপ ভাষাও ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে এই প্রত্যয় ও ভাষা সত্য না মিথ্যা ৪।২২।

ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলিলে কত গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, পাঠকগণ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমাদের অদ্যকার সিদ্ধান্ত এই—

(১) ব্রহ্ম, নিত্য নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা;

(২) তাঁহার অবস্থা-ভেদ স্বীকার করা যায় না; তিনি নিত্য এক অবস্থাতে বর্ত্তমান।

(৩) ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্বাদি কারক থাকিতে পারে না।

(৪) ব্রহ্ম সর্ব্বদাই 'একরস' তিনি সর্ব্ব প্রকার-ভেদ রহিত।

(৫) ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জগৎ প্রপঞ্চ ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(৬) 'কার্য্যকারণ' বলিয়া কিছু নাই। মূর্খ ব্যক্তিই কার্য্য ও কারণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিষয়ে পর প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা। (১)

শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই অদ্বৈতবাদ ভারতের অতি প্রাচীন সম্পত্তি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদটীকে বেদ গ্রন্থ হইতেই লইয়াছেন এবং বেদান্তদর্শনে উহারই পুষ্টি সাধন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই ভারতে খুব প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে এবং ইহাই খুব সমীচীন এবং বিজ্ঞান সম্মত। আমরা সম্প্রতি 'উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়,অতি বিস্তৃতভাবে শঙ্কর-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একদল লোক আছেন, যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী, এবং ঐন্দ্রজালিক বাজীকররূপে প্রতিপাদন করিতে বড়ই ব্যস্ত এবং শঙ্করের গৌরব লোপ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাও নূতন নহে। অনেক দিন হইতেই শঙ্করের মায়াবাদটীর উপরে বিবিধ অবিচার আরোপিত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই গড্ডালিকা-প্রবাহের অনুসরণ না করিয়া, শঙ্করের বিবিধ ভাষ্য এবং তাঁহার ভক্ত শিষ্যবর্গের সাহায্যে তাঁহার অদ্বৈতবাদের যে তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উপরোক্ত গ্রন্থে দেখাইতে যত্ন করিয়াছি।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কি প্রকার? এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শঙ্কর মতে, এক ব্রহ্ম সত্তাই বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টির পরে সেই সত্তাই অসংখ্য নামে ও রূপে বিকশিত হইয়াছেন।* সৃষ্টির অর্থ কি? সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক।† ইহারই নাম সৃষ্টি। পূর্ব্বে কেবল মাত্র ব্রহ্মসত্তা ছিলেন, সৃষ্টির পরে সেই ব্রহ্ম-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম ও রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা এবং সেই সত্তার আশ্রয়ে কতকগুলি নাম ও রূপ—ইহারই অর্থ সৃষ্টি। যেমন প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভক করিলে কেবল মাত্র জীবনের ক্রিয়া হয়, কিন্তু আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া তখন হয় না, কিন্তু কুম্ভক ছাড়িয়া দিলে জীবনক্রিয়ার উপরে আবার আকুঞ্চন-প্রসারণাদি অধিক ক্রিয়া হইতে থাকে,‡ এইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম-সত্তামাত্র থাকেন, সৃষ্টির পরে সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম ও রূপ ব্যক্ত হয়। এই নাম-রূপ লইয়াই জগৎ। জগতের যত কিছু পদার্থ, সকলেরই কোন না কোন 'রূপ' আছে। এবং কোন না কোন নাম আছে। এই নাম-রূপগুলি ব্রহ্ম সত্তার আশ্রয়েই অবস্থিত; ইহাদের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাই এই নাম-রূপগুলির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। নাম রূপগুলিতে অনুস্যূত এই সত্তা দ্বারাই আমরা

---

* প্রাগুৎপত্তে আত্মৈকশব্দ প্রত্যয়গোচরং জগৎ। ইদানীং অনেক শব্দ প্রত্যয় গোচরমাত্মৈক শব্দ প্রত্যয়গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ।—ঐতরেয় ভাষ্য।

† শঙ্কর-শিষ্য বিদ্যারণ্যকৃত অনুভূতি প্রকাশ,২।৬০।

‡ বেদান্ত ভাষ্য।২।১।২০

ব্রহ্মের সত্তা অনুমান করিতে পারি। * কেন না, এগুলির ত নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ব্রহ্ম সত্তাতেই ইহাদের সত্তা।

কিন্তু এই অসংখ্য নাম-রূপগুলি অভিব্যক্ত হওয়াতেও, ব্রহ্ম সত্তার কোন ক্ষতি হয় নাই, তিনি পূর্ব্বেও যে ব্রহ্ম-সত্তা, এখনও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। স্বর্ণ যখন হার ও বলয়াকার ধারণ করে, তখন কি স্বর্ণ প্রকৃতই কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে? হার এবং বলয়—স্বর্ণেরই রূপান্তর মাত্র। স্বর্ণই হার ও বলয়ের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। স্বর্ণের সত্তাকে তুলিয়া লও, তোমার হারও নাই, বলয়ও নাই। সুতরাং নামরূপগুলির দ্বারা, ব্রহ্ম সত্তার কোন ক্ষতি হয় না। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, এক ব্রহ্মসত্তাই নাম রূপগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। নাম রূপগুলি সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে। †

যাহারা তত্ত্বদর্শী নহে, তাহারাই মনে করে যে, নাম-রূপগুলির স্বতন্ত্র স্বার সত্ত আছে। এই স্থলেই ভ্রমের মূল বীজ। অজ্ঞানীরা যাহাকে পদার্থের সত্তা মনে করে, বাস্তবিক পক্ষে উহা ব্রহ্মসত্তা মাত্র। ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা।

যাহার নিজের সত্তা নাই, তাহা নিশ্চয়ই 'অসত্য' এবং 'কল্পিত।' এই উদ্দেশ্যেই শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে নাম-রূপ গুলিকে বা জগৎকে 'অসত্য' 'কল্পিত' 'মিথ্যা' প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই অনেক স্থলে শঙ্কর জগৎকে ইন্দ্রজালের ন্যায় অসত্য, গন্ধর্ব নগরের ন্যায় অসৎ, মায়ামরীচিকার ন্যায় কল্পিত বলিয়াছেন। এই উক্তিগুলি নাম রূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। অনেকে এই উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া যান। শঙ্কর বারংবার দেখাইয়াছেন যে, 'শক্তির দ্বারা জগৎ সত্য, আকারের দ্বারা জগৎ অসত্য।' জগতের প্রত্যেক পদার্থে যে ব্রহ্ম-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছেন; তাহা চির-সত্য। নাম-রূপগুলি সেই সত্তারই আকার বিশেষ মাত্র। ঐ আকারগুলির স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা আছে যদি মনে কর, তবেই তুমি ভুল বুঝিলে। আকারগুলি ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদের আবার নিজের সত্তা কোথায়? কিন্তু অজ্ঞানীরা ত এভাবে জগৎকে দেখে না। অজ্ঞানীরা প্রত্যেক বস্তুকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই বোধ করে। সুতরাং অজ্ঞানীরা যে ভাবে জগৎকে দেখিয়া থাকে, সে ভাবে জগৎ সত্য হইতে পারে না। সে ভাবে জগৎ—অসত্য, মায়াময়, ইন্দ্রজালের ন্যায় এবং মরু-মরীচিকা ও গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় মিথ্যা। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। ‡

পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ প্রকার সিদ্ধান্তে নাম-রূপ বা জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। নাম-রূপ গুলিকে শঙ্কর ব্রহ্ম-সত্তারই আকার বিশেষ ও নাম বিশেষ—এই ভাবে বোধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নাম-রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে

* তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।২ "নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী।" ইত্যাদি। "অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ, নচৈবং"—ইত্যাদি।

† "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি, একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্।"—বেদান্ত ভাষ্য।

‡ "সর্ব্বত্রদ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে। . . ... তয়োর্ব্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি, নতু সদ্বুদ্ধি," ইত্যাদি—গীতাভাষ্য।

বোধ করিতেই কেবল তিনি নিষেধ করিয়াছেন মাত্র। তিনি এই জন্যই বলিয়া দিয়াছেন যে, জগৎ বা জগতের পদার্থগুলি কেহই স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু নহে; জগৎ বা জগতের পদার্থগুলি—ব্রহ্মসত্তারই রূপ ভেদ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য মাত্র বা বিভূতি মাত্র। *

শঙ্করের এই অদ্বৈত-বাদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদে আমরা ইন্দ্র, আদিত্য, সোম, রুদ্র, সবিতা, দ্যৌঃ, পৃথিবী, অদিতি প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ ও স্তুতি দেখিতে পাই। এই দেবতাবর্গ, ব্রহ্মসত্তারই কার্য্যভেদমাত্র, ব্রহ্মসত্তারই বিবিধ বিকাশ মাত্র। নিরুক্তকার যাস্ক এই দেবতাবর্গকে "আত্মজন্মানঃ," "কর্ম্মজন্মানঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারা আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহারা ক্রিয়ার বিবিধ বিকাশ মাত্র। ইহাদের কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এক ব্রহ্মসত্তাই, বিবিধরূপে ও বিবিধ নামে জগতের সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সেই ব্রহ্মসত্তারই বিবিধরূপ এবং বিবিধ নাম মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ঋগ্বেদে এই ব্রহ্মসত্তাই, বিবিধ নামে ও রূপে স্তুত হইয়াছেন।

অদ্বৈত-বাদই যে ঋগ্বেদের লক্ষ্য, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা ক্রমে ক্রমে কতগুলি যুক্তির অবতারণা করিব। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যেই এ সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান রহিয়াছে। উপনিষদ গুলিতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বৈদিক তত্ত্ব ও বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে বেদান্ত-দর্শন বুঝা আবশ্যক। বেদান্তদর্শন দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে বেদান্ত শাস্ত্রের মীমাংসাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরনীয়। সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদেই বা দেবতাবর্গের সম্বন্ধে কি প্রকার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত আছে, তাহাও দেখা আবশ্যক। সর্ব্বোপরি, ঋগ্বেদেই বা এই দেবতাবর্গের কি প্রকার প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের উপাস্য জড়শক্তি নহে। প্রাচীন ঋষিগণ জড়শক্তি বলিতে কাহাকে ও বুঝিতেন না। তাঁহারা অভিব্যক্ত বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ বলিয়া বুঝিতেন। ব্রহ্মসত্তাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া, স্বতন্ত্ররূপে, তাঁহারা কোন শক্তি বা বস্তু বা ক্রিয়া বুঝিতে পারিতেন না। সকল পদার্থ বা শক্তি,—সেই এক চেতন-সত্তারই বিকাশমাত্র; সকল পদার্থের মধ্যেই সেই চেতন-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট; প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ ইহাই মনে করিতেন।

কিন্তু আমাদের মীমাংসার প্রমাণ কি? কি কি প্রমাণের বলে আমরা ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছি? আমরা সর্ব্বপ্রথমে বেদান্তদর্শনের প্রমাণ উপস্থিত করিব। বৈদিক তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্যই বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বেদান্তদর্শন ঋগ্বেদের দেবতা-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বোপরি

* "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় অতি বিস্তৃতরূপে প্রমাণ প্রযোগ সহকারে এ সকল কথা প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শীরা নাম-রূপের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাকেই দেখিয়া থাকেন এবং নাম রূপগুলিকে সেই সত্তারই রূপান্তর বা বিভূতি রূপে বোধ করেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা নাম-রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে বোধ করে এবং নামরূপের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্ম-সত্তার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

আমাদিগকে তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত কি প্রকার? আগামী বারে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতি।

(১)

একটী স্মৃতি সকল স্মৃতির সেরা—
জাগে চিত্ত মাঝে,
একটী গীতি দুঃখ দিয়ে ঘেরা—
সুখের মত বাজে।
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায়-বাণী,
যশের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার ছায়া খানি
সুখে দুঃখে মেশা।

(২)

এসেছিল আমার চিত্তে নামি
ঊষার মত জেগে,
কি গরিমা দেখেছিলাম আমি
আকাশে ও মেঘে;
জন্মান্তরের যেন একটা গাথা
জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির একখানা উজ্জ্বল ছেঁড়া পাতা
এল যেন কেঁপে।

(৩)

ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ
ঝঙ্কারেরি কূপে,
পুড়ে গেল ঊষার দেহের বরণ
নিজের তীব্র রূপে।
ক্ষুব্ধ নইক, আছে সেই স্মৃতি
জীবন আমার ছেয়ে,
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি
আমার পানে চেয়ে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বদেশ-প্রেম।

(সামাজিক)

বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রণালী।

২য় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—মেসের বাসা। সময়—বেলা ৩টা। আসীন—বিজয় ও রমানাথ

রমানাথ। বিজয় তুমি আজ প্রাতে অভিষেক সভাতে যাও নি?

বিজয়। না। বাবা প্রাতে আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। ভাই, বলনা, কি রকম হলো?

রমানাথ। সে দৃশ্য না দেখ্‌লে কল্পনা করা যায় না। কেমন একটা পবিত্র ভাব। যেন স্বর্গ হতে দেবতারা আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ কর্‌ছিলেন। বাতাস যেন সঙ্গীত-লহরী হয়ে খেল্‌ছিল। নির্ম্মল প্রেমের আকাঙ্ক্ষা-শিখা আপনা আপনি যেন স্বর্গের দিকে ভগবানের কাছে উঠেছিল। আর আমাদের গুরুজীর প্রত্যেক কথাটী প্রাণে কেমন বেজেছিল—ভাই তোমাকে কেমন কোরে বল্‌বো?

বিজয়। না ভাই, বলো, সব। হতভাগ্য আমি, সেখানে যেতে পারিনি।

রমানাথ। ভাই, বলি সংক্ষেপে—যেমন প্রভাত হলো, অমনি দলে দলে, সঙ্কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে, সভ্যগণ আসতে লাগলেন। দেবভবন ফুল পাতায় সজ্জিত হয়ে যেন কি মধুর মূর্ত্তি ধরেছে। এদিকে সাদের অভিষেক হবে, এক শ জন গঙ্গায় স্নান ক'রে গরদের কাপড় পরে বেদীর সম্মুখে এসে একে একে বসলো।

বিজয়। হরগোবিন্দ ছিলো?

রমানাথ। সে গঙ্গাস্নান ক'রে সকলের পূর্ব্বে এসেছিল। গরদের কাপড়ে তারে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

বিজয়। বরটীর মত?

রমানাথ। দূর, বরটীর মত কেন? চেলীর কাপড় পরেনি ত, মাথায় টোপরও দেয় নি—বরটীর মত কেন দেখাবে?

বিজয়। শাদা গরদ পরে কাকে বিয়ে কর্ত্তে দেখিনি বটে। যাক, তারপর?

রমানাথ। যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে হাসি হাসি রাঙ্গা মুখে দেখা দিলেন, অমনি ঢং ঢং কোরে পেটা ঘড়ি বেজে গেল। তার পর মন্দিরের দুই দিক থেকে গম্ভীর শঙ্খধ্বনি হলো—ধূনার সুগন্ধে মন্দির পূরে গেল, বেদীতে অমনি গুরুজী বসিলেন। তিনিও গঙ্গাস্নান করে এসেছিলেন—কপালে চন্দনের ত্রিরেখা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে নির্ম্মল ধবল বসন। তিনি যেমন বসলেন, অমনি তানপূরা ও মৃদঙ্গ বাজতে লাগলো। ক্ষণকাল পরে, মেঘেন্দ্র বাবু—সেই মধুর কণ্ঠে ভগবানের গুণ গান আরম্ভ করলেন। সে গান শুনিয়া আমাদের সকলের চোখে জল পড়তে লাগল। কি মধুর সেই গান। শুনতে শুনতে যেন স্বর্গে চলে গেলাম। গান যখন থামলো, অমনি যেন স্বর্গ হতে আমরা মর্ত্ত্যে এলাম।

বিজয়। হতভাগ্য আমি! এমন গান শুনতে পেলাম না। গান হোয়ে গেলেই অভিষেক হলো?

রমানাথ। না। গানের পর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী বললেন "হে অভিষেক-প্রার্থী যুবকগণ। তোমরা অদ্য যে প্রতিজ্ঞা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা পালন করা সহজ নহে। জগতে পালনের পথ, প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের পথ পুষ্পাকীর্ণ নহে, তাহা অনেক সময় কণ্টকময়। সংসারে জড় জগতের হীন আকর্ষণে যাঁহারা বদ্ধিত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা জীবনের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, অর্থের জন্য ধর্ম্ম ও আত্মমর্য্যাদা যাহারা পদদলিত করিয়াছেন, তাঁহারা, তোমাদিগের পবিত্র ও উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা দূরে থাক, তোমাদের উপহাস করিবেন, এবং তোমাদিগের অপেক্ষা আপনাদিগকে বুদ্ধিমান স্থির করিয়া তোমাদিগকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে তোমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এমন স্থানে বাধা পাইবে, যেখানে তোমাদের হৃদ্‌পিণ্ড যেন পরস্পর বিরোধী শক্তির আকর্ষণে ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইবে। তোমাদিগের মস্তক সতত পিতৃচরণে ভক্তি-প্রণত থাকা উচিত। পিতার চরণ পুত্রের নিকট পূজ্য। সেই পিতার আজ্ঞা পালন এক দিকে, আর প্রতিজ্ঞা পালন অন্য দিকে। মনে কর পিতা পুত্রকে বলিতেছেন "পুত্র, অর্থ লইয়া তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" ধর্ম্ম বলিতেছে, সত্যরক্ষা বলিতেছে, "অর্থ লইয়া বিবাহ করিও না"—তখন বিষম সঙ্কট—তখন অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হইবে। প্রত্যেকে মনে বুঝিয়া দেখ, সেই পরীক্ষার জন্য তুমি উপযুক্ত কি? যদি এই উভয় সঙ্কট পরিত্যাগ করি[illegible] এক্ষণে এই ব্রতে দীক্ষিত হইও না—এ[illegible] [illegible]ময় আছে—যাও গৃহে ফিরিয়া যাও। বৎস! তোমার পিতার অনুমতি চাহ, অথবা অনুমতির জন্য অপেক্ষা কর। বলো, তোমরা সকলেই কি দীক্ষিত হইবার জন্য পিতার অনুমতি পাইয়াছ? (হাঁ পাইয়াছি) "ভাল"। (রমানাথ বলিতে লাগিল) তাহার পরে একে একে সকলকেই গুরুজী এই রকম মন্ত্র দিলেন—"বল—

১। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিব।

শিষ্য। "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিব।"

গুরু। বল—(২) "যে বিবাহে অর্থের কথা উঠিবে বা থাকিবে, তাহা আমি করিব না।"

শিষ্য। যে বিবাহে ইত্যাদি—

গুরু। বল (৩) "আমি বিবাহে কন্যাকে কেবলমাত্র সংসার ধর্ম্ম পালনের সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিব, কোন কালে কখনও অর্থাগমের উপায় বলিয়া ভাবিব না।

শিষ্য। আমি বিবাহে কন্যাকে ইত্যাদি।

গুরু। বল—(৩) "আমি যতদিন বিবাহ না করিব, ততদিন জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধ চরিত্র থাকিব।"

শিষ্য। আমি যতদিন ইত্যাদি—

গুরু। বল—(৫) আমি আমার সচ্চরিত্রতা দ্বারা, উপদেশের দ্বারা অন্যান্য কুমারগণকে এই "বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন-সভার' সভ্য করাইবার চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আমি আমার—ইত্যাদি।

(রমানাথ বলিল) এই মন্ত্র একে একে গুরুজী একশত জনকে দিলেন, তৎপরে সকলের গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন।

তখন বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন :—

"বৎসগণ! অদ্য তোমাদের অভিষেক হইল। এক্ষণ, সংসার-রাজ্য যাও। এই অন্ধকারময় সমাজে তোমরা প্রভাতের এক একটা প্রদীপ। তোমরা এখনে সমাজের ভবসা স্থল, রক্ষক। ভবিষ্যতে স্থূল জগতে তোমাদের যে পবিত্র শুভ বিবাহ হইবে, অদ্য আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম জগতে, সেই পবিত্র শুভ বিবাহের পূর্ব্ব-সূচনা হইল। এই আধ্যাত্মিক জগতে সুনীতি রাজকন্যা অথচ তপস্বিনী। হে অভিষেকপূত নবীন তপস্বী, হে বিশুদ্ধ-চরিত্র বালকবীর! অদ্য সেই তপস্বিনী-রাজকন্যা 'সুনীতি'র গলে পবিত্র মাল্য দান করিলে। অদ্য হইতে আত্মা-জগতে 'সুনীতি' তোমার ধর্ম্মপত্নী। যেদিন স্থূল (দেহ) জগতে তোমার বিবাহ হইবে, এই সুনীতি স্থূলভাবে তোমার পত্নী রূপে রূপে মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। এখন যাঁহাকে ধর্ম্মচক্ষে দেখিতে হইবে, তখন তাঁহাকে চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাইবে। তখন তোমার বিবাহ, আত্মা ও দেহে পূর্ণ হইয়া, ভগবানের আশীর্ব্বাদের শরীরী-বিকাশে পরিণত হইবে। তখন তুমি তপস্বী রাজা, তোমার স্ত্রী তপস্বিনী রাজ্ঞী। তখন তোমরা স্বামী ও স্ত্রী—এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের সুচিকিৎসক হইবে—তখন এই ব্রতপূত বিবাহ-বন্ধনে, সনাতন প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে, এই হরগৌরীর স্বর্গীয় পরিণয়ে, মঙ্গলময় জ্যোতির্ম্ময় কুমার উৎপন্ন হইবে—তাহার কার্য্য, চরিত্র, গুণ-গৌরবে তমসাচ্ছন্ন সমাজ আলোকময় হইবে, আনন্দ ও পুণ্যের উৎস ছুটিবে। ভগবান তোমাদিগের সেই সুখের দিন আনয়ন করিয়া দিন। ওঁ ভগবতে নমঃ।

বিজয়। তোমার ত গুরুজীর কথাগুলি বেশ মনে আছে।

রমানাথ। না ভাই, আমার ঠিক মনে নাই। ভাব, গুরুজীর কেমন গম্ভীর কম্পিত স্বর, তখন যেন প্রত্যেক কথাটা কাণের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে।

বিজয়। ভাই, এখন আমি যাই।

রমানাথ। কল্য "দেবভবনে" শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীজী বিশুদ্ধ বিবাহ প্রণয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। আসবে ত?

বিজয়। কি জানি—বাবা যদি নিষেধ করেন।

রমানাথ। তা নিষেধ করবেন না। এমন অন্যায় নিষেধ কেন করবেন?

২য় অঙ্ক। ২য় দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর বৈঠকখানা, কাল-রাত্রি।

রামধন বাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। নীলমণি বাবু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, হাতে একটা হুঁকা। বিজয় (রামধন বাবুর পুত্র) রামধন বাবুকে একখানি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

নীলমণি। মহাশয়! লেখাপড়া অধিক জানি না ও বহি বুঝি না, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি? (বিজয়ের দিকে ফিরিয়া) বাবা। তুমি ত অল্পবয়সেই পণ্ডিত হয়েছ, বলদিনি—এই যে চাউলের দর দিন দিন বাড়ছে—কি কল্লে অল্প বেতনভোগী মধ্য-

বিত্ত ভদ্রলোক এখন বাঁচে ? তাদের বেতন ত বাড়ছে না।

রামধন বাবু (বিজয়ের পিতা) বেশ। বিজয়। তুমি এর উত্তর দেও।

বিজয়। আমার বোধ হয় দেশে যদি চাউলের দর দিন দিন বাড়ে, তাহলে মধ্য-বিত্ত লোকের আয়ও যাতে বাড়ে, তা করা উচিত।

নীলমণি। আমার বেতন বাড়ান আমার হাতে নয়।

বিজয়। আমি বেতন বৃদ্ধির কথা বল্‌ছিনে।

নীলমণি। বেতন বৃদ্ধি যদি না হয়, আমার আয় আর কিসে বাড়তে পারে ?

বিজয়। এমন কোন কাজ শেখা, যা আপনি রাত্রিতে আর প্রাতে কর্ত্তে পারেন। এই পাড়ার শিবনাথ বাবুরা আফিসে কাজ করেন, তাঁরা গঞ্জি ও মোজা বুন্‌তে শিখেছেন, একটা দোকান করেছেন, সেখানে প্রাতে ও রাত্রিতে গঞ্জি ও মোজা তৈয়ার করেন ও বিক্রয় করেন। শুন্‌ছি তাদের তাঁতে লাভ হচ্ছে। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা, যারা এখন অনেক সময় বসে থাকে, তারাও কাপড় বুন্‌তে বা অন্য কোন শিল্পকাজ শিখতে পারে, তা কি হতে পারে না ? বাবা। (রামধন বাবুর প্রতি)

রামধন বাবু। তা হবে না কেন ? আসামে ভদ্রলোকের বাড়ীতে অধিকাংশ স্ত্রীলোক কাপড় বুন্‌তে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, হাতে কাপড় বুন্‌তে এত শ্রম বা খরচা পড়ে যে, লোকে কলের সস্তা কাপড় ফেলে তা কেনে না।

বিজয়। হাঁ, তবে তাঁত ভাল কর্ত্তে পার্লে কি তাঁতে কম শ্রমে ও খরচায় কাপড় তৈয়ারা হতে পারে না ?

রামধন বাবু। পারে।

নীলমণি। বাপু, কল ফল এখন আর পার্ব্বো না। এখন এ বয়সে কি কল কল শিখতে পারি ? আর কোন উপায় বল্‌তে পার না কি ?

বিজয়। আচ্ছা। প্রত্যেক ভদ্র গরিব ভদ্রলোকের যাতে সমুদয় পরিবারের চাউলের সংস্থান হয়, এমন কতক জমী চাষ কল্লে সুবিধা হতে পারে না কি ?

নীলমণি। চাকুরী ছেড়ে জমী চাষ কর্ত্তে হবে ?

বিজয়। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে জমী চাষ করা যায় না কি ?

নীলমণি। ১ম আপত্তি, আমি সেখানে চাকুরী করি, সেখানে জমী পাব কোথা ? ২য় আপত্তি, যদি বা জমী পাই, আমি চাকুরী করি, আমার চাষবাস দেখ্‌বে কে। ৩য় আপত্তি, চাষে যে খরচা পড়বে, তাতে বোধ করি বিশেষ লাভ থাকবে না। কখন কখন লোকসানও হতে পারে।

রামধন বাবু। অনেক স্থানেই জমী পাওয়া যায়। প্রাতে কাছারী যাবার পূর্ব্বে আপনি চাষবাস দেখ্‌তে পারেন। কৃষাণের সঙ্গে ভাগে জোত কর্লে লোকসানের সম্ভাবনা নাই, লাভ হওয়াই সম্ভব।

নীলমণি। মহাশয়, চাকুরী আর চাষ, দুদিক ঠেকান আমার পক্ষে বড় কঠিন বোধ হচ্ছে। চাকুরী ছেড়ে কেবল চাষে ভদ্র-লোকের চল্‌তে পারে না।

রামধন বাবু। পার্ব্বে না কেন ? কিন্তু ভদ্রলোকের চাষবাস কর্ত্তে হলে কৃষি-কাজ রীতিমত শেখা আবশ্যক।

নীলমণি। আমি ভাব্‌ছি আজ কাল চাকুরী পাওয়া বড় কঠিন। চাকুরীতে কষ্টও খুব। যদি কৃষি কাজ চলে, তা হলে আমার ছেলেটাকে কৃষি কাজ শেখাব।

রামধন বাবু। সে ত ভালই।

নীলমণি। মহাশয়, তবে এখন চল্লাম। আরও দু চার জনকে জিজ্ঞাসা করি, তারা কি বলেন।

(নীলমণির প্রস্থান)

বিজয়। বাবা, সেদিন গ্লাডষ্টোনের কথাটা কি বলিছিলেন।

রামধন। কি বিষয় ?

বিজয়। গরিব শ্রমী লোকদের কিসে অধিক উপকার হয়—সস্তা দরে জিনিষ পেলে, না অধিক কাজ পেলে ?

রামধন। অধিক কাজ পেলেই শ্রমী-দের মঙ্গল। Gladstone বলেন—"It is a

mistake to suppose that the best mode of giving benefit to the labouring classes is simply to operate on the articles consumed by them; if you want to do them the maximum of good, you should rather operate on the articles which give *them a maximum of employment"**

বিজয়। Tariff Reform বিষয়টা কি আমাকে আজ বুঝিয়ে দেবেন ?

রামধন। আজ সময় নাই, কাল হবে। দেখ বিজয়,তোমাকে আবার সাবধান কোরে দিচ্ছি। তুমি যেন কোন হেঙ্গামে ফেসাদে মিশো না।

বিজয়। আজ্ঞে, মিশ্‌বো না।

(বিজয়ের প্রস্থান)

রামধন। (স্বগতঃ) বিজয় ভাল ছেলে, নম্র, পিতৃভক্ত। সে কখনই আমার অবাধ্য হতে পার্ব্বে না। এ বিয়েতে সে মত কর্ব্বে। দেখি তার মাকে আজ কি বলে।

৫ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর অন্তঃপুর। কাল—সূর্য্যাস্তের সময়।

আসীন বিজয় ও তাহার জননী।

বিজয়। মা! বাবা কোথায় ?

জননী। বেড়াতে গিয়েছেন।

বিজয়। কখন আস্‌বেন ?

জননী। কেন ?

বিজয়। কেদার বাবু তাঁর জন্য বাহিরে বসে আছেন। ২৭৲ টাকা মাহিনে ত তার কোন মতেই চলে না। তাই বাবা তাকে কি একটা কাজ দেবেন—তাই বোধ হয় এসেছেন।

জননী। বাবা, তোমাকে একটী কথা বলি, বিয়ের কথা বল্‌লেই তুমি পালাও।

বিজয়। মা আমি এখন চল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

জননী। না—তুমি বসে আমার কথা শুন। তোমার বাবা তোমাকে বল্‌তে বলেছেন—শোন।

বিজয়। কি বল। শুন্‌ছি।

জননী। বলি, বকুলপুরের পাত্রীটী বেশ সুন্দরী? কেদার বাবুর মেয়েও খুব সুন্দরী। আমার তাতে আপত্তি নাই, তবে উনি রাজি নন। উনি যখন বল্‌ছেন, বকুলপুরের জমীদারের মেয়েটীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তোমার তাতে কি অমত করা উচিত ?

বিজয়। আমি ত আপনাদের সকল কথাতেই স্বীকৃত আছি, কেবল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে পার্ব্বো না। ঐ বিয়েতে, বা যে বিয়েতে বাবা মত কর্ব্বেন, যদি টাকা না নেওয়া হয়, আমি তাতে কখন অমত কর্ব্বো না।

জননী। উনি বলেন, ছেলে বাপের মতে চল্‌বে,না বাপ ছেলের মতে চল্‌বে ?

বিজয়। আমি এর উত্তর কি দিব মা ?

জননী। তিনি বলেছেন, আমি চার দিন অপেক্ষা কর্ব্বো। তারপর যদি বিজয় আমার কথা না শোনে, আমি পরে তার মুখ দর্শন কর্ব্বো না। উনি বড় জেদী মানুষ, তা জানত বাবা। আমার ভয়, কি কর্ত্তে কি হয়।

বিজয়। আমি রাজি না হলে বাবা কি আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দেবেন ?

জননী (কাঁদিয়া ফেলিলেন, চখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন) বিজয়, বিজয়, কি বল্‌ছিস—তোকে ছেড়ে কি আমি এক দণ্ড বাঁচি, অমন দারুণ কথা কখন মুখে আনিস নে।

বিজয়। (চোখে জল এসেছে) মা। বাবা আমাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেন দেবেন, কি কর্ব্বো। পথের কাঙ্গাল হতে হয়, হব। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে কখনই পার্ব্বো না।

জননী। বিজয়! বিজয়। (পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) বিজয়! তুই কি আমাকে ফেলে চলে যেতে পারিস (উভয়ের অশ্রুমোচন)

বিজয়। তাঁহার জননীর চরণ ধরিয়া) মা, তোমার পা ধরিয়া মিনতি করতেছি, তুমি কাঁদিয়া আমাকে মিথ্যাবাদী করিও

---

* গত আশ্বিন মাসের নব্যভারতে ২৯২ পৃষ্ঠাতে ভুল ক্রমে ইহার ভিতরের দুই ছত্র ছাপানে বাদ পড়িয়াছিল।

না। আমাকে যদি গৃহত্যাগ কর্ত্তে হয়, তাহলে তুমি যে কাঁদবে—তা মনে করে আমার এখনি যে বুক ফেটে যাচ্ছে (দুই-জনেরই ক্রন্দন।

(মনোরমার প্রবেশ)।

মনোরমা। মা কাদ্‌ছ কেন, দাদা তুমিও যে কাদ্‌ছ (এই বলিয়া মনোরমা বিজয়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল,—

দাদা! বাবা তোমাদের বকেছেন, (মনোরমার ক্রন্দন)

বিজয়। মনোরমা, কিছু নয়, কাঁদিসনে। বলিয়া মনোরমার কপাল চুম্বন করিলেন (স্বগত) এই হয়ত আমার শেষ বিদায়।

মনোরমা। দাদা, তোমার চোখে আবার যে জল পড়্‌ছে—আবার কাঁদ্‌ছ?

বিজয় (চোখ মুছিয়া) কই, বাহিরে কেদার বাবু এসেছেন। তোর মাষ্টার হবে, জানিস্‌?

মনোরমা। (চোখের জল মুছিয়া) ইঃ—আমার মাষ্টার হবে বই কি! আমি যে মার কাছে পড়ি।

বিজয়। এখন আসি মনোরমা। মা চরণধূলি দেও।

(উত্তমানন্দের বক্তৃতা)।

৪র্থ দৃশ্য।

সন্ধ্যা হইল। কলিকাতা সহরে দীপাবলী জ্বলিল। "দেবভবন" উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিময় হইল। বালক, যুবক ও বৃদ্ধের স্রোত দেবভবন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। আজ উত্তমানন্দের বক্তৃতা হইবে, তাই সেখানে এত লোকের সমাগম। আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। সকলেই শ্রীমৎ উত্তমানন্দের আগমন ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৭টা বাজিল। অমনি শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন উত্তমানন্দ বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। এবং চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"দীর্ঘকাল পরে, আমি অধুনা এই রাজধানীতে আসিয়াছি। চতুর্দ্দিকে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। কেমন একটা নূতন ভাব দেখিতেছি, কোথাও রাজনীতির কল্লোল, কোথাও চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ, কোথাও বা ভয়, কোথায়ও বা ভরসা—কখনও বা হৃদয়াকাশে আতঙ্কের উল্কাপাত দেখিতেছি, কখন বা যেন হাস্যমুখী আশা-উষার কনক কিরণচ্ছটা—দেখিতে পাইতেছি। কখন বা এই মলয় সমীরণ বহিতেছিল, পাখী ডাকিতেছিল, কবিত্ব ও সঙ্গীত ছুটিতেছিল, আবার এই বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, অম্বর পথে কড় কড় ধ্বনি শুনিতেছি—এ কি ভাব। আমি ভরসা করি, আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হইবে। শীঘ্র নির্ম্মেঘ প্রফুল্ল আলোকে দেশ আনন্দময় হইবে। কিন্তু আপাতত ইহা বিবেচ্য যে, এক্ষণে এই মহানগরীতে সমগ্র দেশে যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখিতে পাইতেছি—ইহা কি রাজনীতি-ঘটিত? ইহা কি কেবল রাজনীতিতে আবদ্ধ? ইহা কি শ্রেয়ঃ লাভ করিবার ইচ্ছা-সম্ভূত? আমি সন্ন্যাসী। সুতরাং রাজনীতির সহিত আমার সংশ্রব নাই। কিন্তু এ কথা আমি বলিতে পারি যে, রাজনীতি সমাজনীতির অন্তর্গত। সমাজের মর্ম্মস্থান ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সমাজদেহ কখনই সুস্থ হইতে পারে না। সমাজ দেহ সুস্থ না হইলে সমাজনীতির অন্তর্গত যে রাজনীতি, তাহা কখন সুস্থ হইতে পারে না। সমাজ যদি পীড়াগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে, সেই সমাজের রাজনীতির অতি উচ্চ উচ্ছ্বাস, অসাধারণ বীরত্ব, লিপ্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের ন্যায়, উন্মাদের অহেতুক হননের ন্যায় নিষ্ফল, ভয়াবহ, শোকাবহ হয়। যত দিন ধর্ম্ম, বিশুদ্ধতা, উচ্চাশয়তা, সমাজের অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত না হইবে, তত দিন রাজনৈতিক চেষ্টা দ্বারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গল কখনই হইবে না। আমাদিগের নিজেদের মধ্যে, পরস্পারের সহিত ব্যবহারে, যদি নীচ স্বার্থপরতা থাকে, আমাদিগের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যদি নীচ বণিকবৃত্তিতে দূষিত হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির সহিত সম্বন্ধ কখনই পরিণামে উচ্চভাবাপন্ন হইবে না, মঙ্গলপ্রদ হইবে না। তাই যাহাতে আমাদের সমাজ, ব্যাধি-মুক্ত হইয়া, সুস্থ ও সবল হইতে পারে, পবিত্র ভাবে কার্য্যে পটু হইতে পারে, তাহার চেষ্টা

করিতে হইবে। সামাজিক ব্যবহারে যে আত্ম-সংযম, দূরদর্শিতা, ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যস্ত হইবে, তাহা আপনাদিগের রাজনৈতিক ক্রিয়াকে সুস্থভাবাপন্ন করিবে, মঙ্গলময় করিবে। যদি প্রেম চাহেন, তাহা হইলে সমাজের হৃদক্ষ তাহা অগ্রে অনুসন্ধান করুন।

আত্মঘাত পাপ। সমাজ অদ্য আত্মঘাতী হইয়াছে, ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার রুধির আপনি পান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ইহা সমাজের একটী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব। যখন এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব অতিশয় বর্দ্ধিত বা ঘনীভূত হয়, তখন সমাজে মহা অনর্থ উৎপন্ন হয়, সেই অনর্থের প্রতিকার না করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। এই দুর্দ্ধর্ষ আত্মঘাতী ভাব, নানা ক্ষেত্রে নানা আকারে বিচরণ করে— কখন বা সমাজের এক অংশ আর এক অংশকে পীড়ন করে—ধনী নির্ধনকে পীড়ন করে, ভূস্বামী কৃষককে দলিত করে, প্রভু ভৃত্যকে নির্য্যাতন করে। কখন বা পরিবারের এক অংশ অপর অংশকে লাঞ্ছিত করে,—পতি পত্নীকে যাতনা দেয়, ভ্রাতা ভ্রাতাকে নিপীড়িত করে। কখন বা এক ব্যক্তির এক অংশ অপর অংশকে, অর্থাৎ নীচপ্রবৃত্তি উচ্চপ্রবৃত্তিকে প্রপীড়িত করে, লোভ কর্ত্তব্যজ্ঞানকে পরাহত করে—ধর্ম্মের পবিত্র সম্পর্ক মধ্যে পাপ বণিক্‌বৃত্তি আনিয়া আত্মাকে জখম করে। যাহাকে আপনারা পাপ বলেন, তাহা ভাল করিয়া দেখিলে একরকম আত্মঘাত, আত্মপীড়ন মাত্র। এই ব্যক্তিগত আত্মপীড়ন যখন অধিক লোকের মধ্যে দেখা যায়, তখন তাহা,—ব্যক্তিগত আত্মপীড়ন, বিস্তৃত হইয়া সামাজিক আত্মপীড়নে পরিণত হয়।

এক একটী মনুষ্য এক একটী সমাজ। যখন কোন মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সমুচিত সামঞ্জস্য থাকে, তখন তাহার সুস্থ ভাব। যখন বিবেকের আদেশে রিপুগণ চালিত ও নিয়মিত হয়, তখন হৃদয়রাজ্যে সুশাসন থাকে, আর যখন রিপুগণ ভাবী-পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে না, আশু সুখের অনুসরণ করে, জ্ঞান বা বিবেকবাণী শুনে না, তখন হৃদয় মধ্যে একটা নৈতিক অরাজকতা ঘটে, নৈতিক অরাজকতা বিস্তৃত হইয়া সামাজিক অরাজকতা উৎপাদন করে। ব্যক্তিগত অরাজকতা ও রাজনৈতিক অরাজকতার মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম এই, উভয়েরই দূরদর্শিতা নাই; উভয়ই বর্ত্তমান উত্তেজনায় অধীর হয়, উভয়ই সামঞ্জস্যকে উপেক্ষা করে, উভয়ই শ্রেয়ঃ বলিয়া যাহাকে অনুমান করে, তাহাতে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, তাহাতে আত্মপীড়ন হয় মাত্র।

যাউক সে কথা। সামাজিক আত্ম-পীড়নই আমার অদ্যকার ব্যাখ্যার বিষয়। সামাজিক আত্মপীড়নের নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র অদ্য আমি আলোচনা করিব। কিন্তু যে আত্মপীড়নে অদ্য ভারতের অযুত অযুত পরিবার অবসন্ন হইতেছে, এবং যাহা নানা দিকে সমাজকে নীচ, দুর্ব্বল, দুঃখ-সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেই সামাজিক আত্মপীড়ন—"নীচ বণিক্‌ভাবাবিষ্ট বিবাহপ্রণালী" সম্বন্ধে আমি অদ্য আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাহি। কিন্তু এই বক্তৃতার পথ কুতর্ক-কণ্টকে দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ সেই কণ্টকগুলি আমি উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিব। আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিবেন কি ? (বলুন বলুন) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মল্লিনার বিবাহে।

১

ছিলি আমাদের মেয়ে, আমাদের মুখ চেয়ে,
একান্ত আপন ;
আমাদের কোলে কাঁখে, আমাদের বাহুপাকে,
জড়ায়ে জীবন।
দেছি পূর্ণ দশ বর্ষ স্নেহ, যত্ন, সুখ, হর্ষ,
আদর, সোহাগ,
আমাদের যাহা শুভ, যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব,
যাহা পুণ্যভাগ।

২

এ আনন্দ-মহোৎসবে, মধুর বাঁশরী-রবে
বিষণ্ণ হৃদয়।
এত হাসি, ফুলরাশি, তবু আঁখিজলে ভাসি—
কত মনে হয়!
মনে হয়,—সংসারের শত-সুখ-দুখ ফের,
তরঙ্গ ভীষণ।
কত কষ্ট, কত ব্যথা, কত ছলা, কুটিলতা,
কতই পীড়ন!

৩

যত কেন মনে স্মরি, রাখিতে পারিনা ধরি,
উঠে হুলুধ্বনি।
হৃদি-অন্তঃপুর হতে সহস্র নয়ন-পথে
দাঁড়াও, বাছনি!
জগতের আলোরাশি পড়ুক মুখেতে আসি!
দয়া মায়া ভুলি—
কঠোর জগত-মাঝ, কঠোর কর্ত্তব্য-কাজ
দিনু হাতে তুলি।

৪

বাঁধিতে নূতন নীড়ে যাও,বাছা,ধীরে ধীরে ;
বাঁধ বুকে বল।
লও সুখ, লও সাধ, লও পিতৃ-আশীর্ব্বাদ
ভরিয়া আঁচল।
লও নিত্যনব আশা, জগজনে ভালবাসা
পূরিয়া হৃদয়।
লও তৃপ্তি, লও শান্তি। রেখে যাও ভুল ভ্রান্তি
দুঃখ সমুদয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(রাজীবলোচন কৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।)

(৩৮৭পৃষ্ঠার পর—শেষ)

কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন. তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন নবাব ভাইজীউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারির বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে এবং

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে সেও প্রমাণ বটে কিন্তু আম্ম আম্ম শাস্ত্র মতে এই হয় যে শরণাগত জনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না অতএব দেশাধিকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের সঙ্কা কিন্তু শরণাগতের সে সঙ্কা করিবে না তাহার প্রমাণ অনেক অনেক শাস্ত্রে আছে সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অতএব যেখানে প্রাণপণ সেখানে শরনাগতের জন্য যদি দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে যদ্যপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্ম্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হবে। অতএব আপনকার নিকট উত্তম উত্তম পণ্ডিত আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি তাহারদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তবে আমি ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দু লোকেরদিগের ছিল আপনকার নিকটে অনেক অনেক হিন্দু চাকর আছে তাহারা অবশ্য আপন আপন শাস্ত্র জ্ঞাত আছে দেখ অতি পূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন। এক দিবস দণ্ডী রাজা মৃগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক অশ্বিনী দেখিলেন অত্যন্ত চঞ্চল গতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অশ্বিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্মরাজ্যে আসিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্যা হয় ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এইরূপে কিছু কাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ। তখন সেই কন্যা কহিলেন আমি স্বর্গের নৃত্যকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকট নৃত্য করিতেছি অন্যমনস্কা হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল। তাল ভঙ্গ হওনে ইন্দ্র উষ্মা করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বন মধ্যে নৃত্য কর গিযা। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম। পরে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইবা এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেক তারপর মুক্ত হইবা আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিযা দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয় হইতে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছে সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইযা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেক যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শুনিয়া পলাইয়া অনেক অনেক স্থানে গমন করিলেন। পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্টির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ইহার দিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন। ভীম আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই। দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর

সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবেক কৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি। অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেয়া মত নহে। ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া মহা ক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। পশ্চাৎ ভীম আপন সহোদরেরদিগকে সম্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি শুনিয়া মহা ক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসিলা। ভীমার্জ্জুন কহিলেন আপনি যে কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্ম্ম জ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম। এরূপে কথোপকথন অনেক হইল পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম স্থানে গমন করিলেক॥

অতএব আমি হিন্দু লোকের কাছে এমন কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং হিন্দু শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে শরণাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না। আমারদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট নিষেধ আছে তথাপি বার বার লিখিতেছেন আপনি এ দেশের কর্ত্তা আপনকার নিকটে জাতীয় মানুষ্য আছে এবং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন বিশেষত আমারদিগেরগণ প্রাণ সত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না। অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কোশল ক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব এই ক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে স্থির থাকিবেন। আর যে লিখিয়াছেন আমারদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজ কর অধিক লাগিবেক কিন্তু আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে হস্তিনাপুরের সম্রাটের রাজা যিনি এই নিয়ম করিযা দিযাছেন এবং কত কত সুবা গিয়াছে কখন অধিক দিই নাই এখন অধিক দিব না। আপনি বিবেচক বিবেচনা করিয়া যে সৎ পরামর্শ হয় তাহাই করিবেন॥

এইমত লিখন লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইলেন॥

নবাব সাহেব কলিকাতার কোঠির বড সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইযা পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না অতএব আর এক পত্র লিখহ যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই নতুবা আমি কলিকাতা লুট করিয়া তাহারদিগকে এ দেশে থাকিতে দিব না। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়। তাহাতে নবাব কহিলেন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আনহ। মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম শিষ্টাচারের পর লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব্ব যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমান বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজারদিগের এইপণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তার রাজ্যের বহুল্য হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বানিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান তবে ভাল্ই নতুবা আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধ সজ্জা করিবেন কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণে তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুৎ কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক কিন্তু আর আর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎ পরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন ॥

কোঠির বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া আপনার চাকর লোককে জ্ঞাত করিলেন আর কহিলেন আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কদাচ দিব না অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু নবাব এ দেশাধিকারী তাহার সৈন্য অধিক আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি সৈন্য নাই তাহাতে চায়া কি তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ অতএব আত্ম আত্ম পরিবার অন্য দেশে প্রেরণ কর আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখহ।

এই মত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অনেক অনেক গেল নবাব স্রাজেরদৌলা কদাচ কাহার বাক্য শ্রবণ করিলেন না মহা ক্রোধান্বিত হইয়া যাবদীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ ব্যবহারণ কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন ॥

কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব শুনিলেন যে নবাব স্রাজেরদৌলা সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমারদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি সংপ্রতি নবাব সসৈন্যে রণ করিতে আসিতেছেন তোমরা সকলে সাবধানে থাকহ এবং আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া দেহ। সাহেবের যত যত চাকর লোক সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে প্রবর্ত্ত এবং সাহেবের আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আত্ম আত্ম পরিজন লোককে অন্য স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরাণ কোঠির গড়ের উপর থরে থরে কামান রাখিয়া রণ সজ্জা করিয়া সকলে সাবধানে থাকিলেন। তখন পুরাতন কোঠির নীচে গঙ্গা ছিলেন তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন এবং যাবদীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই জাহাজে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন এবং বাগবাজারের পুলের উপর পচিশ কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিলেন।

কিঞ্চিৎ যোগে নবাব স্রাজেবদৌলা সব সৈন্য লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বাগবাজারের পুলের নিকট উপনীত হওয়াতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সৈন্য ছিল তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয়ী হইতে পারিতেছে না এবং নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। কলিকাতা নিবাসী লোক সকল তরণীতেই প্রায় আছে। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকা যোগে বঙ্গ দেশেতে গমন করিয়া অতি গোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক রণ করিয়া কোঠির বড় সাহেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগর নিবাসিরদিগের ধন এবং দ্রব্য যে যাহা পায় সে তাহাই লইতে লাগিল। পশ্চাৎ নবাবের প্রধান প্রধান সৈন্য সকল পুরাণ কোঠির নিকট উপনীত হইলেই কোঠির সাহেব রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাবের সৈন্যও রণ করিতে লাগিল কিন্তু কাহার শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন। সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা কখন কেহ দেখে নাই শীলা বৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়িতেছে। এইরূপ সপ্তাহ রণ হইল নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিলেন। কোঠির সাহেবের সৈন্য অল্প কি করিবেন গড়ে তিষ্টিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রণ করিতে লাগিল। কোঠির বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক প্রকার রণ করিলেন বিস্তর সৈন্যের অল্প সৈন্যে কি করিতে পারে। অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাষাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভদ্র লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে এ দেশের আর মঙ্গল হয় না কেন না বিদেশী সওদাগর লোক আর আসিবে না যে অন্যায় উপস্থিত হইল অতএব যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আর ঈশ্বর যদি জবনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল হবে নতুবা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবেক। এই রূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল আর সকলেই মনে ২ নবাবের মন্দ কহিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি কহে ভাই হে ইঙ্গরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অন্য স্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তার দ্বিগুণ বেতন মিলিত। এই রূপ সকলে সাহেবের গুণানুবাদ করিতে প্রবর্ত্ত।

পরে নবাব স্রাজেবদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন কোঠির সাহেবের চাকর লোকের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞা মতে সকল ভৃত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে প্রবর্ত্ত হইল নগর মধ্যে উত্তম স্থান রাখিলেক না। এইরূপ নগর ভগ্ন করিয়া সর্ব্বত্রে সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরসদাবাদে গমন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না। এই রূপ এক বৎসর গত হইল।

পরে ইঙ্গরাজ সাহেবলোক সৈন্যে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূত দ্বারায় সংবাদ জ্ঞাত হইলেন যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানিতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য

কলিকাতায় ছিল তাহারদিগের সঙ্গে রণ করিয়া সে সব সৈন্য নিপাত করিয়া কলিকাতার কোঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাত্ সকল মনুষ্য পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক চাকর ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া আপন ২ পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পশ্চাত্ সাহেবের নিকট নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া আত্ম ২ সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব হাস্য করিয়া অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সেই২ লোক সেই২ কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগর বাসী লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই। পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাতে আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম যে বিলাতের আজ্ঞা না পাইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি নবাবের সহিত রণ করিব তাহারা আমার সাহায্য করিবেন কি না এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি যে উত্তর করেন তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা করহ। প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে দূত প্রেরিত করিয়া সম্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া মহা রাজার নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে পত্র দিল। রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সম্বাদ পাইয়াছিলেন পরে পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আপন মঙ্গল এবং অনেক অনেক প্রকার শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন সাহেব পুনর্ব্বার আগমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছেন ইহাতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি এবং বুঝি আমারদিগের এ রাজ্য রক্ষা পাইবে। আপনকার সহিত পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সকল সম্বাদ কারণ মুরসদাবাদে মনুষ্য প্রেরিত করিলাম আপনি রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত রাখিবেন মুরসদাবাদের সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিব কিন্তু পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি তাহার অন্যথা কদাচ হবে না॥

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরসদাবাদে আত্ম পাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। পশ্চাত্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরসদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও জগৎসেট ও মীর জাফরালীখান প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্বের সমাচার স্মরণ করিয়া দিলেন। সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া কহিলেন তোমার রাজাকে সম্বাদ দেহ যে কলিকাতায় মনুষ্য পাঠান ও যাহাতে সাহেব ত্বরায় সৈন্য সহিত আইসেন তাহা করেন। মীর জাফরালী খান কহিলেন আমি নবাবের সেনাপতি সকল সৈন্য আমার বসতাপন্ন যেমত যেমত কহিব তাহাই সৈন্যেরা করিবে কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে ইহাই

সাহেব পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনহ তবে যেমত যেমত সাহেব আজ্ঞা করিবেন আমি সেই মত কার্য্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞা করুণ আমি সাহেবতক নিবেদন লিখিয়া করার আনাহব। মীরজাফরালি খান কহিলেন পশ্চাৎ এ দেশের নবাবি আমাকে দিবেন যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না এই সমাচারের উত্তর আনহ। পশ্চাৎ কালিপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় জনেক মনুষ্য দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরসদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ লিখিয়া কলিকাতার সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন নবাব স্রাজেরদৌলার সেনাপতি মীরজাফরালি খান নবাবি চাহিয়াছে আমিও সত্য করিলাম স্রাজেরদৌলাকে দূর করিয়া মীরজাফরালি খানকে নবাব করিব তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি খানকে দিলে সে যেমত উত্তর করে তাহা আমাকে লিখিবা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারায় আপন পাত্রকে জানাইলেন॥

রাজপাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীরজাফরালিখানের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীরজাফরালিখান অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি আর মনোযোগ করিয়া রণ করিব না তুমি সাহেবকে সমাচার দেও যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নবাব করিবেন তেমন আপনিও সত্য করুণ যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর মীরজাফরালিখান হাস্য করিয়া সত্য করিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন॥

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের শঙ্কায় কখন কোন বাটীতে থাকেন ইহা আত্ম ভৃত্য বর্গেরাও জানে না। সর্ব্বদা চিন্তান্বিত এই সকল কথার যোজন কর্ত্তা আমি যদি নবাব স্রাজেরদৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায় তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবেক না ইহাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরসদাবাদ হইতে মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন তুমি অদ্যই কলিকাতায় প্রস্থান কর বিস্তারিত সমাচার সমাচার সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে বাটী প্রস্থান করিল। সাহেব আপনার যাবদীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সুসজ্জ করিয়া প্রস্তুত হও আমি কল্য নবাব স্রাজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব আজ্ঞা মাত্রে সকল সৈন্য রণ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল। সাহেব দেখিলেন সকল সৈন্য প্রস্তুত তখন শুভক্ষণে সাহেব গমন করিলেন। নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল বাদ্যের ধ্বনিতে,

এবং সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সকল লোক চমত্কৃত হইয়া সকলেই জয় জয় ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুকে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল। সাহেব হাস্য করিয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য দৌরাত্ম্য করিতে না পারে। সাহেব এইরূপে সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরসদাবাদ তক সমাচার হইল যে ইঙ্গরাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন এবং নবাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাকহ। সাবধানে সমর করিয়া কোন রূপে ইঙ্গরাজ জয়ী হইতে না পারে বাকি যে সৈন্য এখানে থাকিল তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব কিন্তু ইঙ্গরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণা জানে কোন রূপে ত্রুটি না হয় সাবধান সাবধান। সেনাপতি মীরজাফরালি খান বিস্তর বিস্তর সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণ সজ্জা করিয়া আছেন কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন কি রূপে ইঙ্গরাজেরা জয়ী হবেন অনেক বিবেচনার পর সৈন্যের মধ্যে প্রধান প্রধান যে যে সৈন্য তাহারদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিল তোমরা কেহ মনোযোগ করিয়া রণ করিও না যে সেনাপতি সেই যদ্যপি এমন গতি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্য ঔদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল॥

পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নি বৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উদ্যম ক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহন দাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেক আপনি কি করেন আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহন দাস কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি খান ইঙ্গরাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পুরের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহন দাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহন দাসকে পচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহন দাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালিখান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহন দাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমারদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন সে মোহন দাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা

মানেন না। মোহন দাস বিবেচনা কবিল এ সকল চাতুরী এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরচ্ছেদন কবিয়া পুনরায় সমর কবিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা কবিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়া মোহন দাসকে নষ্ট কবহ। আজ্ঞা পাইয়া এক জন মনুষ্য মোহন দাসের নিকট গমন কবিয়া অগ্নিবাণ মোহন দাসকে মাবিল সেই বাণে মোহন দাস পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কবিল ইঙ্গরাজের জয় হইল॥

পরে নবাব স্রাজেবদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া মনে ২ বিবেচনা কবিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এক্ষান হইতে পলায়ন কবি। ইহাই স্থির কবিয়া নৌকোপরি আরোহণ কবিয়া পলায়ন কবিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন কবিয়া মীরজাফরালী খান মুরসদাবাদের গড়েতে গমন কবিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয় ২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধান ২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস কবিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই ২ কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত কবিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালীকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমারা সকলে সাবধানে পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজা লোকে দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন॥

পরে নবাবস্রাজেরদৌলা পলায়ন কবিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রি দেও এক জন মানুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাবস্রাজেরদৌলা বিপন্ন বদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা কবিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ কবিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনো মধ্যে স্থির কবিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন কবিয়া প্রস্থান করুণ। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রির আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাবস্রাজেরদৌলা পলায়ন কবিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব জাফরালি খানের লোকে এ সম্বাদ পাবা মাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসদাবাদে আনিলেন॥

পরে অতি গোপনে নবাব মীরজাফরালি খানের পত্র মীর মিরণকে সংবাদ দিয়া ইঙ্গরাজের বড় সাহেবকে সংবাদ দিতে যায় তাহাতে মীর মিরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন

যে আর কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মিরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড সাহেব এ সংবাদ শ্রবণ করেন তবে স্রাজেবদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমাদিগেরও মঙ্গল হওয়া ভার এবং যে২ পাত্রমিত্রগণেরা আছে ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বরং নবাব স্রাজেবদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক অতএব নবাব স্রাজেবদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির করিয়া আপনি খড়্গ হস্ত করিয়া নবাবস্রাজেবদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব স্রাজেবদৌলা দেখিলেন মিরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে তখন মিরাণকে অনেক২ স্তুতি করিলেন। কিন্তু নিদয় মিরণ কদাচ শান্ত হইল না। পশ্চাত্ নবাব স্রাজেবদৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন তখন মিরণ খড্গাতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক। এই সকল বৃত্তান্ত বড সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহা ব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।

মহা রাজ মহেন্দ্র পাত্র কর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন। তখন বড সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সে মত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন। স্থানে২ সাহেব লোক কর্ত্তা নবাবের লোকে কার্য্য করে এই রূপ রাজ কর্ম্ম হইতে লাগিল। রাজ্যের শাসন দিন২ হইতে লাগিল প্রজা লোকের যথেষ্ট সুখ কোন শঙ্কা নাই ভয় ক্রমে কেহ কাহার উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না রাম রাজার ন্যায় মনুষ্য সকল সুখী হইল। এই রূপে কাল ক্ষেপণ করেন॥

কিঞ্চিৎ কালের পর বড সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজা বড সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড সাহেব রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাহা তাহা বিস্তারিত করিয়া বল আমি পূর্ণ করিব। মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষিত। এই কথার পর বড সাহেব রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়কে কহিলেন তুমি আমার বিশ্বাস পাত্র এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্ব্বত্র জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্ব্বদা করিব। মহারাজাকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন। পর দিবস রাজাকে বিস্তর২ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন আর পূর্ব্বে যে রাজস্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ তঙ্কা ঘুচাইয়া ছয় লক্ষ তঙ্কা রাজস্বের নিবন্ধ করিয়া দিলেন ও রাজার সুখ্যাতি বিলাত্ পর্য্যন্ত লিখিয়া মহা রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রতুল করিয়া এবং যখনকার যে সমাচার সাহেব তক নিবেদন জ্ঞাত করায় একারণ সর্ব্বাংশে ভাল একজন লোক বড় সাহেবের নিকটে রাখিয়া আপনি রাজধানিতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বে যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন যাবদীয় মনুষ্য পত্রাদিতে লিখেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহা রাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর

এইরূপে সর্ব্বত্রেই মহা রাজার সুখ্যাতি হইল॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী প্রধান রাণীতে পঞ্চ পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম রাজা শিবচন্দ্র দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র তৃতীয় মহেশচন্দ্র চতুর্থ হর-চন্দ্র পঞ্চম ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চম পুত্র বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র। রাজার এই ছয় পুত্র। পুত্র সকল সর্ব্বাংশে উত্তম নানা বিদ্যাতে বিশারদ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র, সকলের রূপে এবং গুণে অত্যন্ত হৃষ্ট রাজার সর্ব্বক্ষণ ধীরবর্গের সহিত অশেষ শাস্ত্রের বিচারেই কাল ক্ষেপণ এবং নিদ্রাধিকার অতিশয় গাসিত যাবদীয় লোকের প্রতি দয়া এবং দরিদ্রে দান ক্ষুধার্ত্ত জনেরে ভোজন করান এইরূপে কাল ক্ষেপণ। কিছু কালানন্তর বিবেচনা করিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত শান্ত এবং পণ্ডিত সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন। এবং আপনি ঈশ্বরে মনস্থির করিয়া ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা পিতৃ সেবাতেই মনোযোগ এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বর প্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়ম মতে ক্রিয়া-নন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব লোক অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা বিদায় করিয়া অধিকারের প্রতুল করিয়া দিয়া রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন॥

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী আমার পূর্ব্বপুরুষ মহা রাজ কৃষ্ণচন্দ্রাদি মহাশয়ের যেমন যেমন রাজ নীতি কর্ম্ম করিয়াছেন সেই মত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণা দিবা আমিও সেইমত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণেরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহা রাজ আপনি মহা মহোপাধ্যায় সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার অপেক্ষা নাই তবে যখন যে স্মরণ করান তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিব-চন্দ্র রায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করেন॥

কিঞ্চিৎ কালের পর মহারাজা শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন পূর্ব্বে যে সকল মহারাজারা আমারদিগের বংশে ছিলেন তাহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অত-এব আমিও সেই মতাচরণ করিব ইহাই স্থির করিলেন॥

কিঞ্চিৎ গৌণে নবদ্বীপ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটা যজ্ঞ করি অতএব অপনারা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতবর্গেরা কহিলেন মহারাজ সোম যাগ করুণ। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতের-দিগের বাক্যে উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়া এবং বহুবিধ দান করিয়া ইশ্বরে মনোর্পণ করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বর-চন্দ্র রায়। কিছু দিনান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বের যে সকল মন্ত্রীরা ছিলেন সে সকল মন্ত্রী-দিগেরও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মনুষ্য

না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্ত দিন দিন রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থ ব্যায় এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইহার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহা রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ন্যায় দাতা এবং ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন ও বহুবিধ দান করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন॥

পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেব লোক সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। এইক্ষণে তিনিই নবদ্বীপের রাজত্ব করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের মহা রাজারা যেমত ব্যবহার করিয়াছেন সেইমত আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় অত্যন্ত দাতা যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করেন না এইরূপে রাজ্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহা রাজারদিগের যে সকল কৃত্য তাহার যেরূপ ব্যায় ছিল এখন যে রাজ্যের ন্যূনতা হইয়াছে তথাপি সে সকল ব্যায়ের ন্যূনতা নাই এবং পূর্ব্বে যেমত যেমত রাজনীতি ছিল ও এখনও সেই মত আচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশিষ্ট হয় পণ্ডিতবর্গেরা অদ্যাপি আগমন করিলেও পণ্ডিতের যথেষ্ট সম্মান করেন এবং অশেষ প্রকার ধীর সকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন কোন মতে নিন্দা করেন না॥

॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাশয়ের চরিত্র॥

॥ সমাপ্ত হইল॥

স্বর্গত রমণী-মণি চপলাবালা গুহ।*

"Not in their households merely but over all within their sphere
And in what sense, if they rightly understood and
exercised this royal or gracious influence the order
and beauty induced by such benignant
power would justify us in speaking
of the territories over which each
of them reigned as Queen's
Gardens" Ruskin

মহৎ চরিত্র আলোচনায় যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহার রসাস্বাদ হৃদয়কে উন্নত করে। দৈনন্দিন কৃত্যের অবিরল প্রবাহিত ধারার মাঝে তাহা অবিনশ্বর জগতের চিহ্ন-রেখা মুদ্রিত করিয়া, জগতের মঙ্গলমুখী গতির প্রতি আস্থা জন্মায়, নচেৎ অবাঙ্মুখী প্রবৃত্তির

* এই প্রতিভাময়ী দেবী-প্রতিম মহিলা "মহিলা-সম্মিলনী" প্রভৃতি নানা মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া জীবনের অগ্র প্রভাতে—সপ্তদশ বর্ষের সন্ধিস্থলে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার হস্তে অনেক গুরুভার ছিল। সেই সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে আজ তাঁহার পুণ্যালোক পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ, পত্র, কবিতা প্রভৃতি হস্তগত হইয়াছে—তাহা সমগ্র উদ্ধৃত করিতে পারি নাই. অনেক কিছু উল্লেখও করিতে পারি নাই (প্রবন্ধের ক্ষুদ্রত্ব বশতঃ) এজন্য শ্রদ্ধেয়া মহিলাগণের নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বিনীত লেখক।

উদ্দাম চপলতা ভগবানের সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলসৃষ্টির উপর উত্তরোত্তর যবনিকা ফেলিয়া দেয়।

আগ্নেয়গিরির বহিঃপ্রকাশে গগনবিদারী ধূলি ও ধূম্রপটলের আচ্ছাদন ধরণীকে যতটা ক্লান্ত করে, তাহার বক্ষ হইতে বহ্নিশিখার উজ্জ্বল প্রকাশ ততটা বৈচিত্র্য ও বিপুলত্ব সৃষ্টি না করিলে, উহার বহির্নির্গত গৈরিক-ধারা নগরের পয়ঃপ্রণালীর কর্দ্দমস্রোত অপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিত না।

কাজেই ব্যবহারিক জগতের মাঝে যদি কোন ভাবাকুল হৃদয়কে দেশকালের ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখা যায়—শ্রদ্ধার সহিত আমরা তাহা অবলোকন করি এবং বিস্ময়-হর্ষে জগতের মর্ম্ম-তটে উহার জন্য অমর-আসন রচনা করিতে থাকি। সে তাহার জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল হৃদয়-শ্রী লইয়া এত সহজে স্বভাব-সুলভ গৌরব-কিরিট ধারণ করিয়া, সম্রাটের ন্যায় স্বকীয় আসন গ্রহণ করে যে, আনন্দমগ্ন-জনতা উহার ঐশ্বর্য্যে নিজের দীনতা ভুলিয়া যায় এবং হর্ষরসে আবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালের জন্য উদ্দেশ্যহীন, আদর্শহীন জীবন-পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিজের মাঝে উহার স্তিমিত ছায়া অনুভব করে।

বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্য, তাহার বক্ষদেশ এইরূপ নরনারীর পূতপেলব চরণচিহ্নপাতে অমর হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের গৌরব কাহাদের লইয়া বেশী? ভারতের মাঝে বাঙ্গালা দেশের ললাটে অমর-তিলকচিহ্ন শত-দল শুভ্র কাহার অঙ্গুলি দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে? কাহার সাধনা, কাহার ত্যাগ, কাহার নিষ্ঠা, কাহার শ্রদ্ধার বলে, আজ শত বৎসর পরে, বঙ্গভূমি আবার জগতে কীর্ত্তিত হইতেছে? সে কি নারীজাতি নহে? সে কি বাঙ্গালা রমণীর হৃদয়ের বলে নহে? বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে 'মা' বলিয়া আহ্বান করিল কেন? মাতৃনাম কেন তাহার বক্ষ-শীর্ষ উচাইয়া দিল? সে কি কৌতুকের অভিনয়ের জন্য, না শত শত বৎসর হৃদয়-রাজ্যে পূজিত নারীজাতির প্রতি তাহার অন্তরের অনন্যসুলভ শ্রদ্ধার অনিবার্য্য আবেগের প্রেরণায়?

বাঙ্গালার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে তাহাদের ত্যাগে, প্রেমে, শ্রদ্ধায়, স্নেহে, ভক্তিতে যে জাতি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে—সে জাতি সময়ে জগৎকে বিস্মিত করিবে। এ বিশ্বাস প্রতিদিন প্রমাণিত হইতেছে! ধর্ম্মে, সাহিত্যে,—সর্ব্বত্রই নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পথ নিদর্শন প্রতিদিন বাঙ্গালী দেখাইতেছে।

একথা কি অমূলক, বাঙ্গালা দেশের, অন্যদেশের কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—সমগ্র উত্তেজনা ও উত্থানে, মাতৃজাতির বুকের রক্ত জীবনী স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে? নচেৎ তাহা দু'দিনের অস্থায়ী চাঞ্চল্যে কি পর্য্যবসিত হইত না? অলক্ষ্যে, মায়াদেবীর ন্যায়, উপাখ্যান কথিত অমূর্ত্ত পুরলক্ষ্মীর ন্যায়, তাহারাই দেশের কর্ম্মপ্রবাহ সুস্থ করিয়া দিতেছে, মূঢ় দেশ তাহা লক্ষ্য করিতেছে না! চারিদিকে আত্মগীতির জয়ঢাক বাজিয়া উঠিলেও নব-জাগ্রত দেশের কয়েকটী রমণী-মণির—নারী নেত্রীর—উল্লেখ করিতেও কেন সংবাদ পত্র কুণ্ঠিত হয় কিম্বা ভুলিয়া যায়? তাহাদিগের চরিত্র বিস্মৃতির কবলে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা কি দেশের পক্ষে লজ্জার কথা নহে? কেন এই অকৃতজ্ঞতার দোষ বাঙ্গলা দেশকে কলঙ্কিত করিতেছে?

প্রবন্ধ-আখ্যানে [illegible] মৌনগৌরবাসী।

মাতৃচরিত্রের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালা-সাহিত্য কেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে না? তাঁহারা, তাঁহাদের অন্ততঃ কয়েকজন, স্থানেস্থানে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত না হইয়া পারি না।

এই প্রবন্ধে একান্ত শ্রদ্ধার আস্পদ যে প্রতিভার মূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব, তাহার প্রভাব এইরূপ বিস্তৃত ছিল যে, তজ্জন্য কিছুমাত্র ভূমিকার প্রয়োজন নাই এবং এজন্য বর্ত্তমান লেখকেরও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন, কারণ শক্তির বহিস্ফূর্ত্তি এবং প্রকাশ কখনও করতালির উপর নির্ভর করে নাই। কাজেই যদি এই রমণীমণির অমর আত্মার লৌকিক অবস্থান-জাত বহুমুখী কর্ম্মপরম্পরার আদর্শ আমার দুর্ব্বল লেখনী চিত্রিত করিতে না পারে—তবে তাঁহার অসীম উদারতা লেখককে মার্জ্জনা করিবে; এ বিশ্বাস লেখকের আছে।

লৌকিক হৃদয় বিশেষে আদর্শের বিশেষ স্ফূর্ত্তি, ভবিষ্যকর্ত্তব্যের স্বচ্ছসুক্ত ধারণা হঠাৎ কখনও হয় না—সমগ্র জাতির অন্তর্গূঢ় বহুকাল সঞ্চিত মর্ম্মকথা কোন প্রতিভাময় চিত্তকে আশ্রয় করিয়া মঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাহার ভিতর দিয়া জাতির শ্রেষ্ঠ বেদনা, শ্রেষ্ঠ চিন্তা জাগ্রত হইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে—সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা, সেই চিন্তাপ্রবাহের বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ সাধন না করিলে সে আকুল হইয়া উঠে।

এই আকুলতার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এবং যে পর্য্যন্ত এই আদর্শের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা প্রতি হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া তাহার সাধনা সার্থক না করিয়া [illegible] না করে,—তাহার দৈনন্দিন আকুলতার চরম সিদ্ধি মুকুলিত ও ফলভারনত করিয়া না তোলে, ততদিন পর্য্যন্ত, এই বিপুল নিষ্ঠার ভার প্রয়োজন হইলে, জীবন হইতে জীবনান্তর পর্য্যন্ত, এক সাধকের অন্তর্দ্ধানের পর, সমানধর্ম্মী অন্য সাধকে সংক্রামিত হইয়া, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করে।

কাজেই যদি কোন মহৎ চরিত্রের প্রশংসা ও স্তুতি করা যায়, তবে তাহার ভাগ ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে বাঙ্গালার জনসাধারণ লাভ করুক, প্রতিভাময় জীবন এইরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় বিনয় প্রকাশ করে। মহিলা-চরিত্রের এই গৌরবভার নারী জাতির প্রাপ্য, সন্দেহ নাই।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত রমণী-মণি চপলাবালা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষোভ এই যে, অতি তরুণ বয়সে তাহার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সামান্য অংশ মাত্র সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া সে ভগবানের অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। যদি তাঁহার আদর্শ হৃদয়ে লইয়া কোন মহিলা তাহার আবদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্নপরায়ণা হন, তবে তাহার অশ্রান্ত চেষ্টা ও ইচ্ছা সার্থক হইবে এবং বিনীত লেখকের এই প্রবন্ধ লিখার উদ্দেশ্যও ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। সেই আশা করিতে পারি কি? বাঙ্গালার মহিলা সমাজের মাঝে বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সমাজগত সীমাহীন বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে, এজন্য এক্ষেত্রে কার্য্য করা বিশেষ ক্ষমতা-সাপেক্ষ। বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ ধৈর্য্য, বিশেষ ত্যাগ, বিশেষ কষ্টস্বীকার প্রয়োজন।

এই সমস্ত অধিকার করিতে অক্লান্ত সাধনা চাহি, নিবিড় নিষ্ঠা চাহি। সরল উদার চিত্ত,

মধুর প্রকৃতি, বুকভরা আশা, শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং নেতৃত্বের পক্ষে একান্ত অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ের মোহিনী আকর্ষণী শক্তি, চাঞ্চল্যের মাঝে স্থিরতার প্রতিষ্ঠা, উদ্বেগের মাঝে অনাসক্তি—এসব না হইলে নারী-সমাজে কার্য্য অসম্ভব। দুঃখে সহানুভূতি, বিপদে সেবা, নারী হৃদয়ের যাবতীয় মধুর কোমলভাব, ঘন বর্ষার কূলপ্লাবী তড়াগ-সলিলের ন্যায় চিত্তকে ভরপুর না করিলে মহিলা-সমাজে কার্য্য অসম্ভব ব্যাপার।

স্বর্গত চপলাবালার এরূপ মোহিনীশক্তি ছিল, একথা বলিলে সমগ্র কথা বলা হয় না—সে ধীরে ধীরে অধ্যয়নে, চিন্তায় নিজকে নানা কল্পনার মাঝে কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। পিতৃ ভবনের ঐশ্বর্য্য, এবং স্বচ্ছন্দতার মাঝে তাহার বিনয়, তাহার পরদুঃখকাতরতা, ত্যাগ-স্নিগ্ধ ব্যবহার, তাহার সৎসাহস ধীরে ধীরে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার স্বচ্ছ-সরস সরলতা এমন মধুর ছিল—যে স্কুল-সাথী ছাত্রীগণ বাল্য জীবনে তাহাকে ছাড়া থাকিতে চাহিত না। সে সরলতা ও হৃদয়ের মধুর উন্মুক্ততা দ্বারা সকলের মন অধিকার করিত। তাঁহার স্বর্গলোক গমনের পর পিতৃভবনে অগণিত মহিলার আগমন ও তাহাদের মর্ম্মভেদী বিলাপ ও আক্ষেপ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণিত করিয়াছে।

এমন সরলপ্রাণ, শিশুর ন্যায় ব্যবহার তাঁহার মাঝে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেই শক্তি কখনও কোথা পরাভূত হয় নাই। উহা কনক-কীরিটের ন্যায় তাহাকে মহিলা-সমাজে যতটা হৃদ্য ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিত, উহা মহান্ আদর্শ, ভাবের প্রখর তীব্রতা, সত্যের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি, এবং স্বদেশের প্রতি তাহার অশ্রান্ত বিগলিত অনুরাগ নির্ভরও ততটা করিত কিনা সন্দেহ।

চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের আমৃত্যু সভাপতি, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বর্লোক গমন পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ বৎসরের সভাপতি, চট্টগ্রামের যাবতীয় মঙ্গল কৃত্যের জনক স্বর্গীয় পরলোকগত মহাপুরুষ কমলাকান্ত সেন মহোদয়ের কনিষ্ঠতম প্রিয় কন্যা রূপে সে যেরূপ অনাবিল আদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, শৈশব হইতে তাহা ঘন ভাবপুঞ্জে জমাট হইয়া পিতৃদেবের কর্ম্ম জীবনকে ধীরে ধীরে অন্তর্গ্রহণ করিতেছিল। তাহার বুক ভরা আশা, সহস্র সুবর্ণ কল্পনা, দেশের নারী-রাজ্যের বহুমুখী মঙ্গল চিন্তা, পিতৃ এবং পতি কুলের অনন্ত উৎসাহ সঞ্চার করিত।

এই উৎসাহের অমূর্ত্ত প্রভাবে নানা কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া—বিদ্যুতের মত জগৎ রাজ্যে দেখা দিয়া যেন সে অন্তর্দ্ধান করিল। দেশের ঘন দুর্দ্দিন-প্রদোষে, রজনীগন্ধার ন্যায় তাহার সংহত সৌরভ, অজ্ঞাত মধুর অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে যেন সমস্ত হৃদয়ময় উৎসারিত করিয়া হিরণ্য-আলোক দীপ্ত উষার অপেক্ষাও করিতে চাহিল না। কর্ত্তব্য আনন্দের অপেক্ষা রাখে না, সাধকের নিষ্ঠার ফল সাধারণ ভোগ করে।

দেশের অন্তঃপুরচারিণী নারী-রাজ্যে নবজাগ্রত ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রজীবনের মৌন-সংযত জীবন ধারা প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত ঢালিয়া দিবে, তাহার সরল-শুভ্র চিত্ত নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করিত। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের নিষ্ঠাপূত নিভৃত প্রচ্ছন্ন আড়ালে কপোত-কোমল রমণীর হৃদয়-রাজ্যে তাহার নিবিড় ঘন শ্রদ্ধার

উদ্রেক করিয়া তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিত। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদের উজ্জ্বল আলোক লাভ করিয়াও যুগাগত পল্লীজীবন সাবল্যের মাদকতা তাহাকে উত্তরোত্তর আবিষ্ট করিত।

তাহাদের মাঝে নব নব শিল্প দ্রব্যের নির্ম্মাণ কলা বিস্তারে যেন সে অধীর হইয়া উঠিত! যে মস্‌লিন্‌-অবগুণ্ঠন হিন্দুরাজ্যের গৃহলক্ষ্মীদের অলক্তক-রঞ্জিত কান্তি-শ্রী পল্লবাচ্ছাদিত মালতী-বকুল চম্পক-চামেলীর ন্যায় অভিনব রহস্যজালে আবৃত করিয়াছে—তাহা তাহাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব গোপন করিতে সক্ষম হয় নাই, উহা বাঙ্গালার কর্ম্ম জীবনকে হেম-রসে সিক্ত ও আর্দ্র করিয়া শুভ ভাবশুভ্র চিত্তে লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াছে। ইহা চপলাবালার বড়ই প্রিয় বস্তু ছিল। সে বলিত,পল্লীর মাঝে যারা দিন দিন অন্নাতুরকে অন্ন দান, পীড়িতের সেবা, শিশুরাজ্যের আনন্দ ও স্বাস্থ্য বিধান, এবং ঐশ্বর্য্যমুক্ত নিরহঙ্কারে বাঙ্গালীর গৃহকর্ম্মের শোভা বিধান করিতেছে, কোন্ রাজার মহিমা তদপেক্ষা মহিয়সী?

তাহার এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ছিল যে, সহজে সকলে তাহার অঙ্গুলি-হেলনে চলিত। পিতৃগৃহে বাস্তবিকই তাহার তরুণ মূর্ত্তি রাজনন্দিনীর গৌরব-মণ্ডিত ছিল। নবযুগের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা-প্রাপ্ত পিতা মাতা ভ্রাতা তাহার কথাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিত, তাহার অনুরোধকে উপেক্ষা করিত না।

ভগবানের মঙ্গল বিধানে যখন সে যোগ্যতম জীবন পথের সাথীকে লাভ করিয়াছিল, তখন সকলের আনন্দের সীমা ছিলনা। সেই রমণী-মণির তরুণ কবি-পতি সাহিত্য-প্রেমিক উৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ লিখেছেঃ—"'চ' আমার জীবনের সব আলো লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে; একদিন কি একটা কথার জন্যও বলেছিল "আমি রাণী" সে'হতে 'সুশী' ও'রা সবাই তাকে 'রাণীমা' 'রাণীমা' কোরে' ডাক্‌ত, চপলের কথা যদি চিরজীবন বোসে ভাবি, তবুও বোধ হয় ফুরাবে না—সে শিক্ষা, সে জ্ঞান, সে ভক্তি, সে স্নেহ, সে প্রেম কত গভীর ছিল, তাহা সংসারের কেউ বুঝতে পারবেনা—আহা এমন অমূল্যরত্ন হারিয়েছি!" *

তাহার কবি-হৃদয়ের এই কথার প্রতিধ্বনি করিবে না, চপলাবালার পরিচিত এমন কেহ নাই। পিতৃগৃহে, পতিগৃহে, সর্ব্বত্রই তাহার সহজ সবল আধিপত্য ছিল!

চপলাবালার কবি-হৃদয় বিধির মঙ্গল আশীর্ব্বাদের যোগ্যতর কবি-হৃদয়ের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। একখানা কবিতা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সে লিখিয়াছে—"হৃদয়ের অপরিসীম ভক্তি ও প্রীতির সহিত এই অমূল্য পুস্তক খানি শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ মহারাণার করকমলে সমর্পণ করিলাম—ইতি সেবিকা শ্রীচপলাবালা গুহ।" শ্রীমান্ মোহিনী মোহনের কবি-হৃদয় হইতে প্রবাহিত কাব্যমুক্তাগুচ্ছ সে নিজ হাতে লিখিয়া লইত। একটা কবিতা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু একটা সুন্দর শ্লোকে এই ভাব উদ্ধৃত আছে—তাহা এই স্বচ্ছ পেলব হৃদয়-যুগলের মর্ম্মকথার ন্যায় ভাসিয়া উঠে।

সে সাধ করিয়া নিজের স্বামীকে 'মহারাণা' বলিয়া লিখিয়াছিল। যে তরুণ জীবনে শ্রীমান্ মোহিনী মোহন এরূপ উচ্চ হৃদয়-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল—তাহা সে

* সুদীর্ঘ বহু পত্রাবলির একতম হইতে উদ্ধৃত।

উপাধিকে সার্থক করিয়া তুলিত। চপলা বালা "একদিন আমার উজ্জ্বল খাতাখানি তাহার প্রিয় দিদিকে দেখাইয়া বলিয়াছিল— "কেমন দিদি, দেখ্‌তে রাজার মত নহে কি? তিনি কেমন কোরে' আমার দিকে দেখে অমন্ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেন, বুঝিনা — আমি বিস্মিত হই, পুলকিত হই, জোয়ারের মত শতশুভ্র তরঙ্গ নিয়ে কোথা থেকে ওঁর ভাব আসে, বুঝি না।" * বিংশতিবর্ষ তরুণ সদ্য মুকুলিত কবি-হৃদয় চপলাবালাকে উপযুক্ত জীবন সঙ্গিনীরূপেই পেয়েছিল।

চপলাবালার ভগবদ্‌প্রেম পিতৃভবনে আদর্শরূপে বিরাজিত ছিল। প্রতি দিন সংযত শুচি হৃদয়ের প্রাভাতিক স্নানান্তে সে দুই ঘণ্টাকাল বক্ষপদে মাথা লুটাইয়া থাকিত। এজন্য তাহাকে অনেক পরিহাসও সহ্য করিতে হইত। "এতক্ষণ পর্যন্ত তুই দেবতার কাছে কি বলিস্ কি ভাবিস্?" বর্ষীয়সীগণ সর্ব্বদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত; সে হাসিয়া অবিলম্বে তাহাদের সমালোচনা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার হাস্যে সকলে পরাভূত হইত। পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে এই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছে।

আমরা যদি কখনও এই ব্যাপার সম্বন্ধে দার্শনিক তর্ক আরম্ভ করিতাম (তর্কে, সে কখনও সহজে পরাজিত হয় নাই, বরং তাহার সরল মার্জ্জিত বিশ্বাস সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত)—সে নেহাৎ গোলমাল দেখিলে পুলক-হাস্যে বলিত—"ও' আমার একটা দুর্ব্বলতা! সৃষ্টিরহস্য বোঝা যায় না—কেহ ভাল বুঝ্‌বেও না!"

কে জানিত, এই দুর্ব্বলতার ভিতর সে ধীরে ধীরে শক্তির অক্ষয় তূণীর সংগ্রহ করিয়াছে। ছোট বড় সকলের উপর সে যে উজ্জ্বল প্রভাব বিস্তার করিত, তাহার তুলনা বড় দেখি নাই। শ্রীমান্ মোহিনীমোহন, বোধ হয়, চপলাবালার আরাধ্য দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিল,—

"এ প্রাণ-কাননে তুমি, আনন্দ কুসুম রাশি
এ হৃদি অম্বর কোণে স্নিগ্ধ তারকা হাসি!
তুমি সত্য, ধ্রুব তুমি, তুমি অখিলের স্বামী,
এ শুষ্ক বক্ষ-কুঞ্জে বাজে গো তোমার বাঁশী।

* * *

"ক্ষীরোদ-সাগর-বুকে অনন্ত শয়নমাঝে,
তুমি ত' শয়ান দেব নাভিপদ্মে ব্রহ্ম রাজে,
কি বিমল, কি পবিত্র, গভীর বন্দনাচিত্র
সাজিয়াছে বিশ্বসনে মধুর গভীর সাজে।
তোমার কম্বু ধ্বনি বিশ্বেরে জাগায়ে তোলে,
তোমারি ঘূর্ণিত চক্র বিজ্ঞাপিছে মহাকালে,
হৃদয়ে কৌস্তুভ-শোভা ভাস্কর বিশ্বের বিভা-
শাসিত এ বিশ্বরাজ্য মুদ্গর শক্তি-বলে।'*

চপলার এই নিবিড়-ঘন ভক্তিরস যে জীবনের মর্ম্মস্থান রচনা করিয়াছিল তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, এই জন্য এই আতিরিক্ত্য সকলে উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু চপলাবালার অমর চরিত্রের বিশেষত্ব সকলের হৃদয়-পটে আঘাত না দিয়া পারে নাই। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত, উকীল মহাশয় জীবনের এই সায়াহ্নেও লিখিতে-ছেন:—

"এই পত্রখানা না লিখিয়া পারিলাম না ‥ কিন্তু আমার প্রাণ যে এখনও হুহু করিয়া কাঁদিতেছে এখনও যে বিরাম পাইতেছি না, এখনও যে চিত্তবৈকল্য ঘুচিতেছে না। * *

* উদ্ধৃত।

* শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন গুহের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে।

"চপলা"—আহা, নাম করিতেই যেন বুকের ভিতর একটা আগুন জ্বলিয়া উঠে। যেন কি জানি কি এক মর্ম্মবেদনায় মনপ্রাণ অভিভূত হয়।... যখন শুনিলাম, তখন বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ রহিলাম। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—মুহূর্ত্তের মধ্যে শরীরের জল রক্ত, সমস্তই যেন শুকাইয়া গেল। এক ফোঁটাও অশ্রুজল চক্ষে আসিল না—শুনিয়াই আমি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ।......ধীরে ধীরে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকায় উঠিলাম বটে, কিন্তু প্রাণের আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। চপলার সেই দেবী-মূর্ত্তি মনে পড়িতে লাগিল—নৌকায় বসিয়া অবিরত কাঁদিলাম। সরলপ্রাণা বালিকা, এই বালিকা বয়সে এত স্নেহ, এত দয়া, এত শ্রদ্ধা, এত সরলতা, এত ভগবদ্ভক্তি কোথা হইতে শিখিল—এই সকল ভাবিয়া কাঁদিলাম।...... এমন স্বর্গীয় মূর্ত্তি হঠাৎ কেমন করিয়া মৃত্যুচ্ছায়ায় মিশিয়া গেল, এ চিন্তা ক্রমে অন্তরকে অভিভূত করিতে লাগিল। ভাবিলাম, ভগবানের লীলা, তিনি জীবের আদর্শের জন্য এই আদর্শচরিত্র ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ভগবান ইচ্ছাময়—তিনি আবার আপন ইচ্ছায় সেই পবিত্রতাময় মূর্ত্তি, সেই পবিত্র চরিত্র—এই কুটিল নর জগতের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত করিলেন।...... আবার ভাবি (প্রাণের একটু আরামের জন্য ভাবি) এই নরজগত, এই পাপ-সঙ্কুল, কুটিল মানব-সমাজে স্বর্গীয় প্রতিমার মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার স্থান হইবে কি রূপে?"

এইরূপ বর্ষীয়ান পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণ স্বগত রমণী-মণির পিতৃভবনে যেরূপ সংযমহীন উচ্ছ্বাসের সহিত বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা রমণীসমাজের উন্নতির ও উৎসাহের নায়িকা বলিয়া এবং তাহাদের ভবিষ্যকার্য্যের কর্ণধার বলিয়া অহরহ ভগবানের নিকট যাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতাম, সে ঐশী রাজ্য হইতে ভগবানের স্বহস্ত-প্রদত্ত বিজয়-তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছিল! শ্রদ্ধেয়, মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র সেন * মহাশয় চপলাবালার পাঠ্য-জীবন সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

"জীবনের অধিকাংশ সময় বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছি এই দীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মেয়ে আমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, কিন্তু চপলাবালার ন্যায় এমন বুদ্ধিমতী এবং সুশীলা মেয়ে আমার হাতে পড়ে নাই। সে পরীক্ষাদি শ্রেষ্ঠ বিভাগে, অতি অল্পায়াসে, এমন কি, আমাদের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া তাহার নিজের প্রতিভায় উত্তীর্ণ হইত। * * চপলাবালার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য, এই যে, সে কেবল একটা ভাল কার্য্য করিয়া, কি কোন ভাল উপদেশ পাইয়া নিজে সুখী হইয়া তৃপ্তিলাভ করিত না, তাহার সঙ্গীরা, অন্যান্য মেয়েরা সে বিষয় শিক্ষা করিলে সে বেশী সুখ অনুভব করিত। সকল বিষয়ে সে অন্যকে ভাল দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইত।...... তাহার সাহিত্য-জ্ঞান বড়ই চমৎকার ছিল। এমন পরকে ভাল করিবার স্পৃহা আমি অতি কম লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। এমন সুন্দরী দেব-প্রতিমা স্বর্গের কি কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই হয়ত ভগবান তাহাকে এত শীঘ্র আহ্বান করিয়া নিলেন।"

বাল্য জীবনের অবসানে চপলাবালার জীবন, ভাবে, প্রেমে, সরলতায় বান্ধবদের ন্যায় বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। "পরকে ভাল করিবার স্পৃহা" তাহার সমগ্র চিত্তকে স্নাত করিয়া শত ধারে প্রকাশিত হইত।

এই স্পৃহার তীব্রতায় এমন একটী কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, যাহাকে, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, সহজেই আদর্শরূপে দাঁড় করান যাইতে পারে।

চপলাবালার এমন একটা প্রখর তীব্র, অগ্নি-করকা-চূর্ণবৎ উত্তপ্ত উদগ্র ঐশীতেজঃ ছিল যে, সে ঐহিক যাবতীয় পদার্থের উপর অপরূপ অনির্ব্বচনীয় পুণ্যরস বিস্তার করিয়া প্রতি দ্রব্যের একটী সহজ অবিনশ্বর

* ইনি অত্রত্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ভক্ত পরিচালক। সমগ্র জীবন তিনি মহিলাদের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সত্তা উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন গুহ কি এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিল ?

"মায়ার কি মন্ত্র জানে কি মোহের জানে সুর,
ও নয়নে জাগে কি মোহিনী।
কষ্ট শোক জীবনের ভ্রূকুটিতে পুড়ে'যায়
আছে তার শক্তি প্রমোদিনী। *

তাহার অভিনব, বিস্ময়জনক রমণী গর্ব্ব ছিল। তাহার সাম্নে নারীজাতি সম্বন্ধে কৌতুক করিয়া কেহ কিছু বলিয়াও ত্রাণ পাইত না। বাঙ্গালী রমণীর বিশ্বজয়ী অমর-প্রভাব গৌরব, চপলাবালা যতটা অনুভব করিত, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইত। মেয়েদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া যে কত উচ্চভাব ব্যক্ত করিত, তাহা সহজে প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে। মেয়েদের ভাবগত ও গানগত ক্ষমতা পুরুষদের অপেক্ষা কিছুতেই কম নহে, বরং তাহাদের স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতার তুলনা নাই--একথা সে বলিত। একবার বর্ত্তমান লেখক কৌতুক ও পরিহাসছলে তাহাকে বলেছিল—"মেয়েদের হৃদয় আছে বটে, কিন্তু তা'রা যে বোধশক্তিতে বালক।" চপলাবালা ইহাতে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে—"তোমাদের মত নিষ্ঠুর জাতিও আর নাই। তোমরা আবার নিজমুখে কি ক'রে বল ?"

রমণী জাতির বহুমুখী চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষতার জন্য যে জাতি আপন কর্ত্তব্যের সামান্য ভগ্নাংশও করে নাই, পল্লীর মাঝে দীনতা-লুণ্ঠিত অবজ্ঞা-পীড়িত বাঙ্গালী রমণীর সূর্য্যোজ্জ্বল প্রতিভার মুদিত-শ্রী যে জাতির হর্ষ-কল্লোলে বাধা দেয় না—সে জাতির পক্ষ হইয়া আমি মর্ম্মের মাঝে এই তিরস্কারকে 'স্বাগত' বলিয়া আহ্বান করিয়া নিলাম।

সে বিশ্বাস করিত, মহিলাদের উন্নতি-সাধন, মেয়েদের নিজেরই কার্য্য, তাহাদের নিজ হাতেই রমণী-রাজ্যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার উচ্চভাবের আতিশয্যে মুগ্ধ হয়ে' তাহার কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় একবার কথোপকথনের মাঝে বলেছিল—যে "যদি মেয়েদের নিজের হাতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতির ভার নিতে হয়, তবে দেশের মাঝে কয়েকজন রমণী কি ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিতে পারে না ?" সে বলেছিল—"সেটা আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ভাব-বিরোধী—তা'তে বেশী কিছু হবে না—সমাজের আনুকূল্য পাওয়া যাবে না। আমাদের গৃহের মঙ্গলভাব গ্রহণ কোরেই, গৃহী হ'য়েই অগ্রসর 'হোতে' হবে। পরিবারের বহুমুখী মঙ্গলকর্ত্তব্যের মাঝে সকল মেয়েদের সঙ্গে নিজের ঐক্য ও সমান ধর্ম্ম অনুভব ক'রে অগ্রসর হ'তে হ'বে।" তাহার ভক্তিভাজন আত্মীয়-গুরু এই কথার সত্যতা অনুভব করিয়া তাহার সিদ্ধান্তের সমীচীনতা স্বীকার করিলেন।

চপলাবালার ঐকান্তিক আগ্রহে চট্টগ্রামে "মহিলা-সম্মিলনী" * প্রতিষ্ঠিত হয়। সরল বালিকার আকুল উচ্ছ্বাসে বর্ষীয়সী মহিলাগণের হৃদয় আর্দ্র হয়। তাহার স্নেহের আব্দার কেহই উপেক্ষা করিতে পারিত না। অত্রত্য শ্রেষ্ঠ এবং শিক্ষিত সকল পরিবারের মহিলাগণ উৎসাহের সহিত এই সম্মিলনীতে যোগ দেন। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা গোলকেশ্বরী খাস্তগির (স্বর্গীয় বিখ্যাত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহোদয়ের বর্ষীয়সী সহধর্ম্মিণী) পূজনীয়া শ্রীযুক্তা নারায়ণী সেন (পূজ্যপাদ স্বর্গত উকিল ও চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের সভাপতি কমলাকান্ত সেন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী চপলাবালার পূজনীয়া মাতৃদেবী) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয়া মহিলাগণ এই সম্মিলনীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের গুণ্ঠন-শ্রী বজায় রাখিয়া এইরূপ নবাদর্শের মহিলা এসোসিয়েসনের ন্যায় সভা স্থাপন করা কিরূপ দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, যাঁহাদের কার্য্যের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের ন্যায় সুবৃহৎ, বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত

* অপ্রকাশিত কবিতা হইতে।

* এই অপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ সম্মিলনী তাহার তরুণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে যুগধর্ম্মের আনুকূল্যে পরিচালিত—ইহার স্থাপনে যত ত্যাগ সাধন প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই "প্রাচ্য-প্রতীচ্য" অনুষ্ঠান সকলেরই হৃদ্য হইয়াছে।
লেখক।

জনপদে ইহার সৃষ্টি কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এই কল্পনার সফলতা হইতে বোঝা যায়,সবল হৃদয় জগতে পরাজয় জানেনা। আমার মনে হয়, গত চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে নানা বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাঝে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি জেলায় নবী-ভূত আদর্শ লইয়া এইরূপ স্থায়ী মহিলা এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

যেদিন এই স্থায়ী মহিলা সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়, সে দিন বয়োজ্যেষ্ঠা বর্ষীয়সী, অগণ্য মহিলাগণ তাহাদের মাঝে কনিষ্ঠতম বালিকা চপলাবালার স্কন্ধেই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্ত করিবার ভার দেন। কোন মহিলা সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"স্নেহের চপলা আমাদের যেরূপ সহজ সরলতার সহিত প্রফুল্ল মুখে উৎসাহ ভরে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রভৃতি বলেছিল, সে দৃশ্য আমি ভুলিব না। ভাবে তাহার ললাট উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল—তাহার দু'টী সুন্দর চোখ্ যেন আনন্দে অধীর হ'য়েছিল। সে অনেকক্ষণ বলিতে লাগিল,আমরা চুপ করিয়া শুনিলাম—ভাবিলাম মেয়েদের মাঝেও কি এমন বল্‌তে পারে? কি উজ্জ্বল-সরল-সুন্দর ভাষা। ... ..."

"মহিলা সম্মিলনী"র কার্য্য কেবলমাত্র আলোচনায় নিবদ্ধ ছিল না। নানারূপ উৎকৃষ্ট মহিলা-রচিত কারুকার্য্য সভায় প্রদর্শিত হইত এবং যিনি নূতন যাহা কিছু জানেন, অন্যকে তিনি তাহা শিখাইতেন। এক একটী অধিবেশন প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপী হইত এবং যাবতীয় কারুকার্য্য সংগৃহীত হইয়া প্রতি অধিবেশনে একটা ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় প্রদর্শনী হইত। প্রত্যেক দ্রব্যই সযত্নে রক্ষিত হইত। সম্মিলনী ক্রমশঃ নানা দিকে কার্য্য বিস্তৃত করিবার জন্য চেষ্টাপর ছিল।

সম্মিলনীর অনুরাগী ও উৎসাহী সভ্যা শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আমি জীবনে কখনও চপলার বিমর্ষ ভাব বা ক্রোধের লক্ষণ দেখি নাই। তাহার হাসিমুখ যেন সদানন্দময় ছিল।

"আমার মনে চপলার দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য সব সময় ভাসিত, আমি ইহা তাহার প্রায় পত্রে ও প্রত্যেক কথায় অনুভব করিয়া লইতাম। * তাহার একটী উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা ও অপরটী রমণীর অতীত লুপ্ত গরিমা আবার জাগাইয়া তুলিতে যথাসাধ্য আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু হায়! চপলা অকালেই চলিয়া গেল! তাহার মনের মহতী ইচ্ছাও অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চপলার মত স্বদেশ-প্রাণা, ন্যায়পরায়ণা একজন থাকিলেও আজ আমরা দেশের কাজে বহু দূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতাম এবং এক দিন আমাদের রমণী নামের অতীত মহা-গরিমা জাগ্রত করিয়া কলঙ্ক কালিমা ধৌত করিতে পারিতাম। হায়! আমার প্রিয় সখী চপলা অতি অল্প বয়সেও দেশের ও দশের চিন্তায় নিযুক্ত ছিল। আমাদের বঙ্গ মাতার অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য, নতুবা অকালেই তাঁহার অঙ্ক হইতে বিধাতা চপলাকে আপন অঙ্কে টানিয়া নিলেন কেন? চপলা হারা হইয়া আজ যে কেবল আত্মীয় স্বজন মর্ম্মাহত, এমন নহে—তাহার গুণরাশি যিনি একবার স্মরণ করিয়াছেন, কিম্বা দর্শন করিয়াছেন, তিনিও শোকাকুল। আজ চপলাবিহনে, চট্টগ্রামস্থ মহিলা সমিতি দক্ষিণ হস্ত-বিহীন! আমাদেরও উৎসাহ এবং আশা-আলোক গভীর হতাশে প্রায় নির্ব্বাপিত।

"আমি চপলাবালার প্রিয়সখীগণকে বিনীত অনুরোধ করি, ভগিনীগণ—যদি তোমরা একান্তই চপলাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাক—তবে এস, চপলাবালা যে সংকল্প হৃদয়ে স্থাপন করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছিল—সেই মহৎ বাসনাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান পূর্ব্বক তাহা সাধন করিয়া

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এইরূপ নানা পত্র উদ্ধৃত করিতে পারি নাই বলিয়া মহিলাগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। লেখক।